



এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে

এইচএসসি বিএমটি দ্বাদশ শ্রেণির (২য় বর্ষ) ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-২ সুপার সাজেশন

শর্ট সিলেবাস

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

কোভিড'১৯ পরিস্থিতিতে এইচ এস সি (বিএমটি) পরীক্ষা-২০২৪ এর পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি

শিক্ষাক্রম: এইচএসসি (বিএমটি) শ্রেণি: দ্বাদশ বিষয়: ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-২

বিষয় কোড-২১৮২৭ তত্ত্বীয়: খা:মু: ৪০ চু:মু: ৬০

অধ্যায় ও শিরোনাম	বিষয়বস্তু (পাঠ ও পাঠের শিরোনাম)	পিরিয়ড সংখ্যা (তাত্ত্বিক)
প্রথম অধ্যায়-ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা (Fundamental Concept of Management)	ব্যবস্থাপনার ধারণা, গুরুত্ব, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি, ব্যবস্থাপনার নীতিমালা, ব্যবস্থাপকের সংজ্ঞা, একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি, বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনার সমস্যা।	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়-পরিকল্পনা (Planning)	পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য, পরিকল্পনার প্রকারভেদ, পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ।	৪
তৃতীয় অধ্যায়-সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making)	সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা, গুরুত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাববিস্তারকারী উপাদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণিবিভাগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সমস্যা।	৩
চতুর্থ অধ্যায়-সংগঠন (Organization)	সংগঠনের ধারণা, গুরুত্ব, নীতিমালা, ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রকারভেদ, সংগঠন কাঠামো।	৩
পঞ্চম অধ্যায়-কর্মীসংস্থান (Staffing)	কর্মীসংস্থানের ধারণা, গুরুত্ব, জনশক্তি পরিকল্পনা, কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, পদোন্নতি।	৪
ষষ্ঠ অধ্যায়-নির্দেশনা ও নেতৃত্ব (Direction & Leadership)	নির্দেশনার ধারণা, উত্তম নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, নির্দেশনার ধরন, নির্দেশনার মূলনীতি, পরামর্শমূলক নির্দেশনা, নেতৃত্বের ধারণা, গুরুত্ব, আদর্শ নেতার গুণাবলি, নেতৃত্বের প্রকারভেদ।	৫
সপ্তম অধ্যায়-সমন্বয়সাধন (Co-ordination)	সমন্বয়সাধনের ধারণা, গুরুত্ব, সমন্বয়ের উপায়, সমন্বয়ের নীতি।	২
অষ্টম অধ্যায়-প্রেরণা (Motivation)	প্রেরণার ধারণা, গুরুত্ব, প্রেরণা দানের উপায়সমূহ, প্রেরণাতত্ত্ব-মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব, হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব।	৪
নবম অধ্যায়-নিয়ন্ত্রণ (Controlling)	নিয়ন্ত্রণের ধারণা, গুরুত্ব, নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণের কৌশল।	৩
মোট পিরিয়ড		৩৩

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

অধ্যায়-০১: ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা: উপকরণসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, সমন্বয়, প্রেরণা ও নিয়ন্ত্রণের মানবীয় প্রচেষ্টাকে ব্যবস্থাপনা বলে। ইংরেজি Management শব্দটির সমার্থক শব্দ হলো 'To handle' অর্থাৎ চালনা করা বা পরিচালনা করা। এই পরিচালনার সাথে মানুষ যেমন সম্পৃক্ত তেমনি অন্যান্য উপায় উপকরণ ও জড়িত। এগুলো পরিচালনার সংক্রান্ত ব্যবস্থাপকের কাজকে ব্যবস্থাপনা বলে। ব্যবস্থাপনা বা Management ইটালীয় শব্দ Maneggiare থেকে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ হল পরিচালনা করা

নিচে ব্যবস্থাপনার কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:-

ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল-এর মতে, “ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, আদেশ-নির্দেশ দেওয়া, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।”

এল.এ এ্যালেন-এর মতে, “ব্যবস্থাপক যা করেন তাই ব্যবস্থাপনা।”

জর্জ টেরীর মতে, মানুষ ও অন্যান্য সম্পদসমূহের ব্যবহারের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীদের উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলি সম্পাদিত করা হয় তাকে ব্যবস্থাপনা বলে।

Preter Dracker-এর মতে, “ব্যবস্থাপনা হলো বহুবিধ উদ্দেশ্য অর্জনকারী এমন যন্ত্র যার দ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য দক্ষ ও কার্যকরভাবে অর্জনের জন্য উপায়-উপকরণের যথাযথ ব্যবহার কল্পে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, প্রেরণা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সামাজিক প্রক্রিয়া।

২। “ব্যবস্থাপক যা করেন তা-ই ব্যবস্থাপনা”- এ কথাটির অর্থ কী? বুঝিয়ে বল।

উত্তর: প্রখ্যাত লেখক এল.এ এ্যালেন বলেন, “ব্যবস্থাপক যা করেন তাই ব্যবস্থাপনা।” এর মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, একজন ব্যবস্থাপক তার কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্য থেকে যে কাজগুলো করেন তাকে তিনি ব্যবস্থাপনা বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য উদ্দেশ্যের আলোকে কর্মযজ্ঞকে বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হিসেবে এটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা-

ব্যবস্থাপনা তার কর্মঘণ্টার মধ্যে এমন সব ব্যক্তিগত কাজ যেমন-খোশগল্প, পার্কে বেড়ানো, খেলাধুলা ইত্যাদি বহু ধরনের কাজ করতে পারেন, যা কখনই ব্যবস্থাপনার কাজ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

ব্যবস্থাপনার মূল কাজগুলোও সংজ্ঞার আওতায় আনা হয় নি।

তাই বলা যায়, এ সংজ্ঞা দ্বারা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। এর ব্যাখ্যা দ্বারা ব্যবস্থাপনার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা পাওয়া গেলেও ব্যবস্থাপনার স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে না। এ কারণেই এটিকে ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

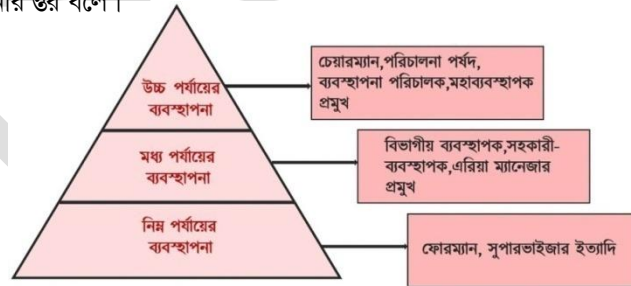
৩। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গৃহীত ধারাবাহিক কার্যাবলিকে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বলে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাই বলা যায়, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, কর্মী নিয়োগ, নির্দেশনা, প্রেরণা দান, সমন্বয়সাধন এবং নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত ধারাবাহিক কার্যাবলিই হলো ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া। ব্যবস্থাপনা হলো মূলত একটি প্রক্রিয়া। কারণ যে-কোনো ব্যবস্থাপনা হলো কতকগুলো কার্যের সমষ্টি।

এ প্রসঙ্গে G.R. Terry বলেছেন, “ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া, যা মানুষ ও অন্য সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের নিমিত্তে পরিকল্পনা, সংগঠন, উদ্বুদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যের সাথে সম্পৃক্ত।” পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এতে নিয়োজিত উপায় উপাদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা হতে শুরু করে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত ধারাবাহিক যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তাদের একত্রে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বলে।

৪। ব্যবস্থাপনার স্তর বলতে কী বুঝ?

উত্তর: যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে নানা ধরনের কার্যক্রম করতে হয়। এ কাজগুলো কোনো একজন বা একদল কর্মী দ্বারা করা সম্ভব নয়। ফলে সুসৃজ্ঞল, ধারাবাহিক ও সমন্বিত উপায়ে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। আর একেই ব্যবস্থাপনার স্তর বলে।



ব্যবস্থাপনার স্তর ৩টি যা পৃথিবীর সবদেশে পরিলক্ষিত হয়। যথা:-

- ১। উচ্চস্তরীয় ব্যবস্থাপনা
- ২। মধ্যস্তরীয় ব্যবস্থাপনা
- ৩। নিম্নস্তরীয় ব্যবস্থাপনা

১। উচ্চস্তরীয় ব্যবস্থাপনা: ব্যবস্থাপনার এ স্তরে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান তথা মালিকগণ অবস্থান করে।

২। মধ্যস্তরীয় ব্যবস্থাপনা: উচ্চস্তরে নির্ধারিত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয় এ স্তরে।

৩। নিম্নস্তরীয় ব্যবস্থাপনা: এ স্তরে মাঠ পর্যায়ে যে-সব সুপারভাইজার, ফোরম্যান, অফিস কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের প্রত্যক্ষ তদারকিতে কার্য সম্পাদিত হয়।

৫। “ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন”-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: F. W. Taylor তাঁর "Principles of Scientific Management" গ্রন্থে ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞানের কাতারে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলো সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। একটি প্রতিষ্ঠানের নিচ থেকে উপর

পর্যন্ত সকল পর্যায়েই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অপরিসীম। তাই আজ অনুন্নত দেশ হতে শুরু করে উন্নয়নশীল, উন্নত ও ছোট বড় সকল দেশেরই ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা সর্বজনীনভাবেই অবদান রাখছে। ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ চিরন্তন প্রকৃতির। তাই ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ দক্ষতার সাথে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করলে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়, যা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠানের সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়। এ প্রসঙ্গে Weihrich and Koontz এর মতে, “উত্তম ব্যবস্থাপনা বিধিবদ্ধ সংস্থার প্রেসিডেন্ট, হাসপাতালের প্রশাসক, প্রথম স্তরের সরকারি তত্ত্বাবধায়ক, ব্যঙ্কাউট নেতা, গির্জার পাদ্রী, বেসবল দলের ব্যবস্থাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত।”

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিভিন্ন মনীষী মাঝে মতভেদ দেখা দিলেও সার্বিকভাবে ব্যবস্থাপনার পরিসরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ব্যবস্থাপনাকে একটি সর্বজনীন কার্যাবলি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া চলে। তাই ‘ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন’ উক্তিটি যথার্থই।

৬। ব্যবস্থাপক কাকে বলে/ব্যবস্থাপকের সংজ্ঞা দাও?

উত্তর: ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার এমন একজন ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য মূলত দায়ী থাকেন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, তিনিই হলেন একজন ব্যবস্থাপক। যিনি কোনো সংগঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কার্যাবলি ও সম্পদ সংগঠিত করেন, নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থাৎ কোনো কাজ করার জন্য অর্থ, সময়, কর্মী, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলো যিনি নিজ হাতে করেন না, তবে তার নির্দেশ মোতাবেক তার সফল ব্যবস্থাপনায় কাজটি সম্পূর্ণভাবে এবং এসব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন তাকে ব্যবস্থাপক বলে।

B.N. Tandon-এর মতে, “যে ব্যক্তি অফিসের কার্যাবলির সাথে আস্থাশীল তিনিই অফিস ব্যবস্থাপক।”

S.P. Arora-এর মতে, “যিনি উর্দ্ধতন নির্বাহী, যিনি কোনো একটি অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যার প্রধান কাজ হলো অফিসকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করা তাকে অফিস ব্যবস্থাপক বলে।”

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়; সেগুলো সফলভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যিনি নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাকে অফিস ব্যবস্থাপক বলে।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি/কী কী গুণ থাকা দরকার? আলোচনা কর।

উত্তর: একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি: নিচে একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি আলোচনা করা হলো:

১. শিক্ষা ও বিশেষ জ্ঞান: বর্তমান যুগের একজন আদর্শ ব্যবস্থাপককে হতে হবে উচ্চ শিক্ষিত এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার নীতি ও কলা-কৌশল, হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন বাজারজাতকরণ, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী।

২. দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান: একজন উত্তম ব্যবস্থাপক তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যেমনি সচেতন থাকেন, তেমনি কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সীমারেখা মেনে চলেন নিষ্ঠার সাথে। ফলে দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্তৃত্বের মধ্যে কখনও সমস্যা বা সংঘাত দেখা দেয় না।

৩. আত্ম-বিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা: একজন উত্তম ব্যবস্থাপককে অবশ্যই নিজের প্রতি হতে হবে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী এবং কাজের প্রতি সংকল্পবদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়ী। এ গুণগুলো একজন নেতা বা ব্যবস্থাপককে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে সাহায্যই করে না, সাফল্যকে ধরে রাখতেও সাহায্য করে।

৪. দূরদর্শিতা: একজন সফল ও আদর্শ ব্যবস্থাপকের অন্যতম গুণগুলো হলো কর্ম ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে দূরদর্শিতা ও সঠিক পূর্বানুমান। কারণ, তিনি লক্ষ্যার্জনের জন্যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অতীত অভিজ্ঞ ও বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে কাজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই কেবল কার্য সম্পাদন অগ্রসর হয়ে থাকেন।

৫. সাহসী ও ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা: কারবার হচ্ছে ঝুঁকির খেলা। তাই একজন ব্যবস্থাপককে অবশ্যই সাহসী, কর্মনিষ্ঠ ও ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারণ, একজন অদম্য সাহসী, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ও আত্মবিশ্বাসী কারবার ব্যবস্থাপকের পক্ষেই সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা ও ঝুঁকির মধ্যে একান্ত নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে কাজ করে ঝুঁকিকে সাফল্যে পরিণত করা সম্ভব হয়।

৬. মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা এবং সামর্থ্য: ব্যবস্থাপনা হচ্ছে মনোজগতিক চিন্তা ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। ফলে একজন উত্তম ব্যবস্থাপকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

৭. কর্ম অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ব্যবস্থাপনা একটি প্রয়োগ বিজ্ঞান। তাই দীর্ঘদিনের কর্ম অভিজ্ঞতা একজন ব্যবস্থাপককে অভিজ্ঞ ও দক্ষ করে তোলে। ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনে সক্ষম হন। এতে করে সাফল্য নিশ্চিত হয় এবং এটাই একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের বৈশিষ্ট্য।

৮. সততা ও বিশ্বস্ততা: সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা একজন উত্তম ব্যবস্থাপকের অন্যতম গুণ। কারণ, ব্যবস্থাপক সৎ ও বিশ্বস্ত না হলে প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র বিরাজ করে নৈতিক বিশৃঙ্খলা। যা শুধু লক্ষ্যার্জনই ব্যাহত করে না, প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংগঠনসমূহের কথা উল্লেখ করা যায়।

উপসংহারে বলা যায়, একজন ব্যবস্থাপকের মধ্যে একই সাথে উপরিউক্ত গুণগুলো থাকা প্রায় অসম্ভব। তবে একথা সত্য যে, কোন ব্যবস্থাপকের মধ্যে উক্ত গুণগুলো অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকলে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন আদর্শ বা উত্তম ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। কারণ, বিশ্বের অধিকাংশ সফল নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কম-বেশি এ গুণগুলো দেখা গিয়েছে।

২। ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: বর্তমান যুগ তীব্র প্রতিযোগিতার যুগ। আর এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকার জন্য ব্যবস্থাপনার অবদান অনস্বীকার্য। এটি ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপ্ত। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্প কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠান এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর। নিচে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো

১. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- ভূমি, শ্রম, পুঁজি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও কার্যোপযোগী করে তোলার জন্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই উৎপাদনের উপকরণগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন নির্ভরশীল।

২. সম্পর্ক উন্নয়ন: উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত সকল পক্ষের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি ও বজায় রাখা। ব্যবস্থাপনার ঐক্য প্রচেষ্টা মানব সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সহজতর করে।

৩. বৃহদায়তন উৎপাদন: বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যবস্থা খুবই জটিল। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে দক্ষ ব্যবস্থাপনার একান্তই প্রয়োজন। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বৃহদায়তন ব্যবসায়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

৪. নেতৃত্ব প্রদান: প্রত্যেক জাতীয় কার্যাবলি সম্পাদনে নেতৃত্ব আবশ্যিক। একটি উত্তম ব্যবস্থাপনা নেতৃত্বের গভীরতা ও প্রসারতার বহিঃপ্রকাশ। ব্যবস্থাপন ছাড়া কোন তত্ত্ব বা মতবাদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক নয়। সুতরাং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের গুরুত্ব অপরিসীম।
৫. দক্ষতা বৃদ্ধি: ব্যবস্থাপনার কাজ হল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জন করা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষতার খেলায় মেতে উঠেছে। তাই ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
৬. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনার অবদান দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। সঠিক ব্যবস্থাপনাকী় পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নিত্যনতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিহার্য।
৭. উদ্দেশ্য অর্জন: একজন মাঝি যেভাবে শক্ত হাতে হাল ধরে নৌকাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়, ব্যবস্থাপনাও ঠিক তদ্রূপ বিচ্ছিন্ন উপকরণকে একত্রিত, সংহত ও সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করে।
৮. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বর্ধিত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, কম মূল্যে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ ও তা সহজে প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে ব্যবস্থাপনা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- পরিশেষে বলা যায়, ব্যবস্থাপনার উপরিউক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও বহুল উৎপাদন, শক্তিশালী সংগঠন সৃষ্টি এবং সামগ্রিক সাফল্য অর্জনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, এমনকি পারমাণবিক যুদ্ধেও ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, যে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জন তথা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। কেননা একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর।
- ৩। ব্যবস্থাপনার নীতিমালাসমূহ আলোচনা কর।
- উত্তর: ব্যবস্থাপনা নীতিমালা হচ্ছে ব্যবস্থাপনাকী় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নির্দেশিকা স্বরূপ। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল (Henry Fayol) ১৯১৬ সালে ফ্রান্সে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ জেনারেল অ্যান্ড ইন্ড্রাসটিয়াল ম্যানেজমেন্ট (General and Industrial Management) এ ১৪টি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রদান করেছেন; এই নীতিগুলোই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে মানা হয়। নিচে হেনরি ফেয়লের ব্যবস্থাপনার ১৪ টি নীতি আলোচনা করা হলো:
১. কার্যবিভাগ: কার্যবিভাগ নীতি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকী় ও কারিগরী সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন হেনরি ফেয়ল। হেনরি ফেয়ল প্রদত্ত এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মীর কাজের আওতা সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যিক।
 ২. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব: হেনরি ফেয়ল বলেছেন যে, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর ঘনিষ্ঠতার সাথে সম্পর্কিত। কোনো কর্মীকে কার্য সম্পাদন করার জন্য কর্তৃত্ব অর্পণ করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও প্রদান করতে হবে। আবার এরূপ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত অন্যথায় কার্যক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।
 ৩. শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা: শৃঙ্খলা বলতে হেনরি ফেয়ল বুঝিয়েছেন মান্যতা, প্রয়োগ, শক্তি ও শৃঙ্খলার সংমিশ্রণ। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা অপরিহার্য। শৃঙ্খলা হলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার অধীনস্থ কর্মচারীদের হতে কী প্রত্যাশা করেন তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত তদারকির ব্যবস্থা করা এবং এসব কাজ সম্পাদিত না হলে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।
 ৪. আদেশের ঐক্য: আদেশেত ঐক্য নীতির মূল কথা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মী শুধু একজন বসের অধীনে থাকবে এবং তার আদেশ গ্রহণ করবে। কারণ একাধিক বসের অধীনে একজন কর্মী সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং সমস্যাই দেখা দেয়।
 ৫. নির্দেশনার ঐক্য: সংগঠনের প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য শুধু একজন প্রধান ও একটি পরিকল্পনা থাকবে; একই উদ্দেশ্য বিশিষ্ট কার্যাবলীর জন্য একটি পরিকল্পনা থাকবে এবং ঐ সকল কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করবেন একজন কর্মকর্তা; এটিই হলো নির্দেশনা ঐক্য।
 ৬. সাধারণ স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ: প্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়াকে আবশ্যিক বলে মনে করেন হেনরি ফেয়ল। তবে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও ব্যক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে যাতে কোনো রকমের বিরোধ বা অসংগতি বা সংঘাত না থাকে সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।
 ৭. পারিশ্রমিক: ন্যায্য বেতন এবং মজুরি নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীদের প্রাপ্য। তাই বেতন ও মজুরির একটি উপযুক্ত কাঠামোর প্রবর্তন করে শ্রমিক-কর্মীদেরকে সর্বাধিক সন্তুষ্টি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। হেনরি ফেয়লের মতে, পারিশ্রমিক ন্যায্য হতে হবে এবং তা প্রদান করার যুক্তিসংগত বা সঠিক পন্থা থাকতে হবে।
 ৮. কেন্দ্রীকরণ: প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং নিম্নস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত থাকে। হেনরি ফেয়ল এক্ষেত্রে বলেন, কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত।
 ৯. জোড়া-মই-শিকল: প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রবাহের একটি শিকল বা চেইন থাকবে। এই শিকল কর্তৃত্বের প্রবাহ ও যোগাযোগের উর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি নির্দেশ করে। জরুরি কাজে সংগঠনের নীচ স্তরের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা থাকবে।
 ১০. বিন্যাস: একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূল কর্ম সংস্কৃতি রাখার জন্য একটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত এবং উপযুক্ত বিন্যাস বজায় রাখা উচিত। বিন্যাস নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক কর্মী ও উপাদান (মানবীয় ও অমানবীয় বা বস্তুগত) যাতে তাদের স্ব-স্ব স্থানে থেকে সুষ্ঠু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
 ১১. সাম্য: সকল শ্রমিক ও কর্মীর প্রতি সমান এবং সম্মানজনক আচরণ করা উচিত। একজন ব্যবস্থাপক বা প্রশাসকের দায়িত্ব হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কেউ যেন বৈষম্যের সম্মুখীন না হয়।
 ১২. চাকরির স্থায়িত্ব: কর্মীদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানে তারা স্থায়ীভাবে কাজ করবেন বা দীর্ঘমেয়াদে কাজ করবেন। অকারণে বা সামান্য কারণে কর্মীদের ঘনঘন বদলী বা ছাঁটাই করা অনুচিত, এটি ব্যবস্থাপনারই ব্যর্থতা। নির্বাহী ও সাধারণ কর্মীবাহিনীর চাকরীকালের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি।
 ১৩. উদ্যোগ: নতুন নতুন পদ্ধতি বা উপায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করার পক্ষে কর্মীদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হেনরি ফেয়লের গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের আগ্রহ বাড়বে এবং উন্নত কর্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।
 ১৪. একতাই বল: যেখানে একতা সেখানেই শক্তি। ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান নীতি হলো একে অপরকে অনুপ্রাণিত করা এবং নিয়মিতভাবে একে অপরের সহায়ক হওয়া। ব্যবস্থাপকের উচিত তার অধীনস্থ কর্মচারীদের দলগত প্রচেষ্টা, একতা ও ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।
- পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত নীতিগুলো সঠিকভাবে পালন করলে একটি প্রতিষ্ঠান কার্যকর ফলাফল লাভ করে পারে বলে ফেয়ল মত প্রকাশ করেছেন।

৪। বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনার সমস্যা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বা ধনতন্ত্র ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা হয়। এ লক্ষ্যে বড় ও মাঝারি আয়তনের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য বর্তমানে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বিরাস্ত্রীয়করণের প্রক্রিয়া চলছে। এতেও এগুলোর ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যাগুলো হলো-

১. দক্ষ ব্যবস্থাপকের অভাব: বাংলাদেশে দক্ষ ব্যবস্থাপকের অভাব আছে। আমাদের দেশে ব্যবস্থাপনাকে পুরোপুরি পেশার মর্যাদা দেওয়া হয় না। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের চেয়ে কম। তাই ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

২. সততা ও দক্ষতার অভাব: ব্যবস্থাপকদের সাথে কর্মীরা সরাসরি জড়িত থাকে। অধীনস্থ কর্মীরা দক্ষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান হলে তারা নির্বাহীর নির্দেশ সহজে পালন করতে পারে। এদেশে অনেক ক্ষেত্রে অধীনস্থদের সততা ও দক্ষতার অভাব থাকায় তারা নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে পারে না।

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সমস্যা: ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমাদের দেশে দক্ষ লোকের অভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কাজক্ষিত মাত্রায় উন্নতি করতে পারেনি। তাই, প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবে ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৪. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি: দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করে সততার সাথে কাজ করলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়। কিন্তু, বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি রোধ করা যাচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বড় অঙ্কের লোকসান দিতে হচ্ছে।

৫. লালফিতার দৌরাভ্য: লালফিতার দৌরাভ্য ও আমলাতান্ত্রিকতা এদেশের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠানেই এখন পর্যন্ত শতভাগ জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। জোরালো জবাবদিহিতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা দেখা যায়। এটি দক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বাধা।

৬। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আমাদের দেশে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগে আরেকটি বড় বাধা। আর এরূপ অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মূল কেন্দ্র হলো শিক্ষাঙ্গন ও শিল্প এলাকা। এ ধরনের অবস্থায় মূলত ব্যবস্থাপকদের করার তেমন কিছু থাকে না। ফলে ব্যবস্থাপনা উৎসাহ হারায় এবং স্থবির ও অদক্ষ হয়ে পড়ে।

উপসংহারে বলা যায়, ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু প্রয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে এ দেশের সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যায়-০২: পরিকল্পনা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। পরিকল্পনা কী?/পরিকল্পনা কাকে বলে?

উত্তর: পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন কাজ কখন, কিভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে এসব বিষয়ের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিকে পরিকল্পনা বলে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিকল্পনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো -

এ সম্পর্কে টেরী এবং ফ্রাংকলিন বলেন, "পরিকল্পনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ কি করতে হবে এ সম্পর্কে ধারণা তৈরী ও বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা।"

এ সম্পর্কে এইচ আইরিস ও এইচ. কুঞ্জ- বলেন, "নির্বাচিত ব্রত বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের বিকল্প কর্মপন্থা হতে উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন করাকে পরিকল্পনা বলে"

ডাব্লিউ. এইচ. নিউম্যান -এর মতে, "কী করা হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে পরিকল্পনা বলে।"

আর. এন. ফার্মার ও ব্যারি এম. রিচম্যান -এর মতানুসারে, "সংগঠিত কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে পরিকল্পনা বলে।"

সুতরাং কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কোন কাজ কখন, কার দ্বারা, কীভাবে সম্পাদিত হবে এ সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যসূচি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে পরিকল্পনা বলে।

২। স্থায়ী পরিকল্পনা কী?

উত্তরঃ যে পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান একবার গৃহীত হবার পর নতুন কোনো অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বার বার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু কাজ রয়েছে যা প্রতি বছর সম্পাদন করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অর্থাৎ যে পরিকল্পনা কোনো প্রকার পরিমার্জন বা পরিবর্তন ছাড়াই বার বার ব্যবহার করা যায়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। যেমন- প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

(i) Ricky W. Griffin-এর মতে, "একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বার বার ঘটে এমন কাজের জন্য তৈরিকৃত পরিকল্পনাই হলো স্থায়ী পরিকল্পনা।"

(ii) WH Newman-এর মতে, "একই কার্যসম্পাদনে যে সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা বার বার ব্যবহৃত হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে।"

পরিশেষে একথা বলা যায়, যে পরিকল্পনা একবার গৃহীত হলে বার বার ব্যবহৃত হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে।

৩। একাধিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: সাধারণত যে পরিকল্পনা একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাত্র একবার ব্যবহার করা হয় তাকে একাধিক পরিকল্পনা বলে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, যে পরিকল্পনা কোন প্রতিষ্ঠানে একবার ব্যবহার করলে দ্বিতীয়বার আর ব্যবহার করা হয় না তাকে একাধিক পরিকল্পনা বলে। এই পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রণীত হয়, উক্ত লক্ষ্য পূরণ হলে এ পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদ একাধিক পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন। নিয়ে তাঁর কতিপয় সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল:

প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদ রিকি ডব্লিউ থিফিন এর মতে, "একাধিক পরিকল্পনা এমন ধরনের কার্যসম্পাদনে প্রণয়ন করা হয়, যা ভবিষ্যতে পুনঃসংগঠিত হবে না।"

বার্টল এবং মার্টিন এর মতে, "একাধিক পরিকল্পনা হল এমন পরিকল্পনা, যা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণয়ন করা হয় এবং একবার অর্জিত হলে ভবিষ্যতে আর প্রণয়ন হবে না।"

পরিশেষে বলা যায় যে, যে পরিকল্পনা নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য অর্জন বা বিশেষ কোন এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হলে তা বাতিল হয়ে যায় তাকে একাধিক পরিকল্পনা বলে।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

৪। স্ট্র্যাটেজি বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ‘স্ট্র্যাটেজি’ শব্দের অর্থ রণচাতুর্য বা রণকৌশল। এটা সামরিক প্রশাসন থেকে নেয়া হয়েছে। “ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হবে এরূপ ব্যক্তিদের প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলায় জন্য পরিকল্পনার রদবদল বা সামঞ্জস্যতা বিধানকেই স্ট্র্যাটেজি বলা হয়।” যেসব ব্যক্তি বা পক্ষসমূহ পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তারা হলো প্রতিযোগী, ক্রেতা, সরবরাহকারী, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এসব পক্ষের প্রতিক্রিয়ার সাথে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠাকালে এসব পক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি সঠিক মনোযোগ না দিলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানাবিধ বাধাবিপত্তি দেখা দিবে।

পরিকল্পনায় স্ট্র্যাটেজির গুরুত্ব অনেক। ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাসমূহ এ স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে মোকাবিলা করেন। কারবার প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করার জন্য নানাবিধ স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা হয়, যেমন- ১। পরিবর্তন সূচনাকরণ স্ট্র্যাটেজি, ২। যৌথপুচ্ছেটার স্ট্র্যাটেজি, ৩। প্রতিরক্ষামূলক স্ট্র্যাটেজি, ৪। সাবধানতামূলক স্ট্র্যাটেজি, ৫। চুক্তিমূলক স্ট্র্যাটেজি, ৬। সময়সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজি। উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, পরিকল্পনায় গুরুত্বসহকারে ব্যবহৃত হয় স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল সামরিক প্রশাসনের মতোই কারবার ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপগুলো আলোচনা কর।

উত্তরঃ ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে অনেকগুলো পদক্ষেপ বা ধাপ জড়িত রয়েছে। নিচে পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলো:-

১। সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হওয়া: সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হওয়া পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে কী চায়, কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে এবং কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে অনুমান করাই সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

২। উদ্দেশ্যাবলি প্রতিষ্ঠা: সমগ্র প্রতিষ্ঠানের ও এর ছোট-বড় বিভাগের আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উদ্দেশ্যাবলি প্রতিষ্ঠা করা এ পর্যায়ের কাজ।

৩। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ: এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে সহায়ক যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তাদের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে হয়। কারণ এসব তথ্যের যথার্থতার উপরই পরিকল্পনার কার্যকারিতা নির্ভর করে।

৪। পরিকল্পনা আঙিনা স্থাপন: পরিকল্পনা আঙিনা বলতে ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় অনুমানকেই বুঝায়। এটি ব্যবস্থাপনাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের ইঙ্গিত বা আভাস প্রদান করে, যা পরিকল্পনার জন্য খুবই দরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ।

৫। বিকল্প কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ: এ পর্যায়ে পূর্বানুমান ও সংগৃহীত তথ্যাদির যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সমাধানসমূহের আলোকে বিকল্প কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করতে হয়।

৬। বিকল্প কার্যপদ্ধতির মূল্যায়ন: পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনুসরণযোগ্য বিভিন্ন বিকল্প কার্যপদ্ধতিগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলো থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ বিকল্পগুলো বাছাই করে এদের প্রত্যেকটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হয়। এ পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদকে অনুগত ও সংখ্যাগত উভয় দিক বিবেচনা করতে হয়।

৭। সর্বোত্তম কার্যপদ্ধতি গ্রহণ: বিকল্প কার্যপদ্ধতি যথাযথ মূল্যায়নের পর এদের ভেতর হতে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একাধিক বিকল্প কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ করতে হতে পারে।

৮। সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন: মূল পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে অনেক গৌণ বা সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-পরিকল্পনা বা সহকারী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

৯। কার্যারম্ভের সময় ও কার্যক্রম নির্ধারণ: এ পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদকে সার্বিক কার্যাবলিকে ধারাবাহিকভাবে ক্রম অনুসারে সাজাতে হয় এবং প্রতিটি কার্যের প্রারম্ভিক ও সমাপনী তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে হয়।

১০। প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতির প্রয়োগ ও অনুবর্তন: এটা পরিকল্পনা প্রণয়নের সর্বশেষ স্তর বা ধাপ। এ পর্যায়ে পরিকল্পনা ভবিষ্যতে কতখানি কার্যকর হতে পারে তা মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তবে কার্যকরী করা হয়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন খুব সহজ কাজ নয়। উপরিউক্ত প্রক্রিয়া যথাযথ অনুসরণ করার মাধ্যমেই একটি ভালো পরিকল্পনা প্রণীত হতে পারে, যা থেকে সুফল আশা করা যায়।

২। পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা/সুবিধা আলোচনা কর।

পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: পরিকল্পনা হলো ব্যবস্থাপনার প্রথম ও অন্যতম প্রধান কাজ। এর ওপর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের উপায়-উপকরণ ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই নয় বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়সহ সব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা কল্পনা করা যায় না। এর গুরুত্ব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা: প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ পরিচালনা করে। পরিকল্পনার প্রধান কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করা। এটি বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জন হয়। তাই, পরিকল্পনাকে উদ্দেশ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার বলা হয়।

২. অনিশ্চয়তা দূরীকরণ: প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কাজ করতে হয়। ভবিষ্যৎ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পর্কে পরিকল্পনার মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায়। এভাবে পরিকল্পনা পরিবর্তনশীল ব্যবসায় পরিবেশের অনিশ্চয়তা দূর করে স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও ধারাবাহিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৩. উৎপাদনের উপকরণের যথাযথ ব্যবহার: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য উৎপাদন উপকরণের (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ, পরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদনের উপকরণ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

৪. ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যা মোকাবিলায় জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হয়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঝুঁকি কমানো এবং অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়। এভাবে পরিকল্পনা ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত করে।

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি: দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল কাজের মাধ্যমে শুধু সমস্যাই বাড়ে। এর মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন কখনও সম্ভব হয় না। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করা হলে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রতিটি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং কার্যকারিতা বাড়ে।

৬. অপচয় হ্রাস: সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত ব্যয় কমে যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুচিহ্নিত কাজ করা হলে কাজ সম্পাদনে খরচ অনেক কম হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ে বাজেট তৈরি করে তার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হলে মিতব্যয়িতা অর্জন সহজ হয়।

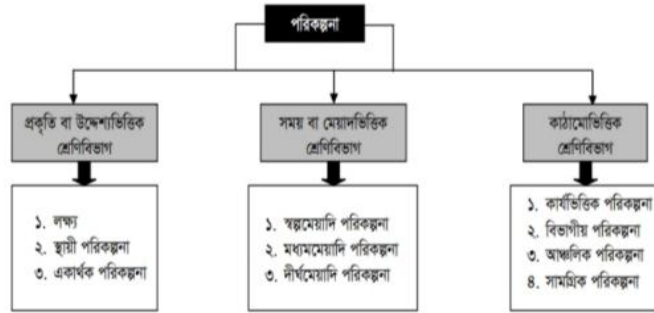
৭. সমস্যা সমাধান: বর্তমানে জটিল ব্যবসায় জগতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা আগে থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকেন। সমস্যার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় বলে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিতে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। বরং, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৮. ভবিষ্যৎ কাজের রূপরেখা: পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের নকশা বা রূপরেখা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে। ফলে তারা তাদের করণীয় সম্পর্কে আগে থেকেই জানতে পারেন। এতে কর্মীরা মানসিক প্রস্তুতিসহ কাজ করতে পারেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনও সহজ হয়।

তাই বলা যায়, পরিকল্পনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সঠিক পরিকল্পনা একটি প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই, পরিকল্পনাকে ব্যবস্থাপনার সার্বিক কাজ পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩। পরিকল্পনার প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর: যে কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা কত প্রকার ও কি কি এ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাকার ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এগুলোতে তিনটি ভিত্তিতে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা হলো:



ক. প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য অনুসারে পরিকল্পনাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. লক্ষ্য:-কোনো প্রত্যাশিত ও সুনির্দিষ্ট ফল অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে লক্ষ্য বলে। লক্ষ্য- এর পাঁচটি উপাদান থাকে - সুনির্দিষ্ট, পরিমাপনযোগ্য, যথোপযুক্ত, বাস্তবসম্মত, নির্দিষ্ট সময়, এগুলো সংক্ষেপে SMART হিসেবে পরিচিত।

২. স্থায়ী পরিকল্পনা:-একই ধরনের সমস্যা বার বার উদ্ভূত হলে সেসব মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে।

৩. একাধিক পরিকল্পনা:- বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে একাধিক পরিকল্পনা বলে। উদ্দেশ্য সাধিত হলে এ পরিকল্পনারও সমাপ্তি ঘটে।

খ. সময় বা মেয়াদভিত্তিক পরিকল্পনার প্রকারভেদ :-

১. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা:-স্বল্পকাল স্থায়ী পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর মেয়াদি হয়।

২. মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা:-মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর থেকে ৫ বছর মেয়াদের জন্য করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সমস্ত পরিকল্পনা এক বছরের অধিক সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়, তাদেরকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা:-দীর্ঘমেয়াদের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৫ বছরের বেশি সময়ের জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে।

গ. কাঠামোভিত্তিক পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ:-

১. কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা:- যে পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কার্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা বলে।

২. বিভাগীয় পরিকল্পনা:- প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা তৈরি করা হলে সেগুলোকে বিভাগীয় পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণীত হলে সেক্ষেত্রে কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও বিভাগীয় পরিকল্পনা একই হয়।

৩. আঞ্চলিক পরিকল্পনা:- সাধারণত বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করে থাকে। আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক পরিকল্পনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অঞ্চল বা শাখার জন্য প্রণীত পরিকল্পনা।

৪. সামগ্রিক পরিকল্পনা:-প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ বা অঞ্চলের পরিকল্পনাকে একত্রিত করে। কেন্দ্রীয়ভাবে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা বা মাস্টার প্লান বলে।

উপরোক্তভাবে আমরা পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারি।

৫। একাধিক ও স্থায়ী পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর: নিচে একাধিক ও স্থায়ী পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	একাধিক পরিকল্পনা	স্থায়ী পরিকল্পনা
১। সংজ্ঞা	বিশেষ কোনো পরিস্থিতি বিশেষ কোনো সমস্যা মোকাবেলার জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে একাধিক পরিকল্পনা বলে।	পৌনঃপুনিক সমস্যার সমাধান বা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যে পরিকল্পনা বারো বারো ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে।
২। কার্যকাল	একাধিক পরিকল্পনা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে লক্ষ্য অর্জনের	স্থায়ী পরিকল্পনা একবার প্রণীত হওয়ার পর পরিস্থিতি

	স্বল্পকালের জন্য প্রণীত হয়।	অপরিবর্তিত অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদের কার্যকারী হয়।
৩। সমাপ্তি	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেলেই এ ধরনের পরিকল্পনা পরিসমাপ্তি ঘটে।	নতুন কোন পরিকল্পনা বা পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের পরিকল্পনা বারবার ব্যবহৃত হয়।
৪। প্রকারভেদ	একার্থক পরিকল্পনা চার ধরনের হয় যেমন প্রদান কর্মসূচী, খন্ড পরিকল্পনা, বিশেষ কর্মসূচি ও ব্যাপক পরিকল্পনা।	এরূপ পরিকল্পনা তিন ধরনের হয় যথা নীতি, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি।
৫। ব্যয়	ব্যয় বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বার বার এরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয় বলে এতে ব্যয় এর পরিমাণ অধিক হয়।	স্থায়ী পরিকল্পনা পুনঃপুন ব্যবহৃত হয় বলে এতে ব্যয়ের পরিমাণ কম হয়।
৬। সতর্কতা	একার্থক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।	স্থায়ী পরিকল্পনা বেশি সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না।
৭। নমনীয়তা	একার্থক পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে বারবার গ্রহণ করার ফলে এতে নমনীয়তার সুযোগ বেশি থাকে।	দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর এটি ব্যবহৃত ও দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হওয়ায় এতে নমনীয়তার সুযোগ কম থাকে।
৮। বৈচিত্রতা	এক্ষেত্রে নতুন নতুন অবস্থায় নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা এতে বৈচিত্রতার সুযোগ থাকে।	স্থায়ী পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয় বলে এতে বৈচিত্রতার সুযোগ কম থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, একার্থক পরিকল্পনা ও স্থায়ী পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। স্থায়ী পরিকল্পনা সার্বিক বিচারে অধিক ফলপ্রসূ হলেও ক্ষেত্র বিশেষ একার্থক পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই।

অধ্যায়-০৩: সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। সিদ্ধান্তের সংজ্ঞা দাও?/সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাকে বলে?

উত্তর: আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। একজন প্রশাসকের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্যতম। উপযুক্ত সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা সাফল্যের চাবিকাঠি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ : সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণে হলো বাছাইকরণ বা পছন্দ করা, যার মাধ্যমে কোন বিশেষ অবস্থায় কি করা হবে বা হবে না তা ঠিক করা হয়। অর্থাৎ, একাধিক বিকল্পের মধ্য হতে সঠিকটি নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

Wehrich and Koontz এর মতে, “বিকল্পসমূহের মধ্য থেকে একটি কার্যধারা নির্বাচন করাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে।”

রবার্ট আর ক্রেইটনার বলেন, “ পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থাগুলোকে চিহ্নিত করে তার মধ্য থেকে উত্তম বিকল্প বাছাই করার প্রক্রিয়া হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ।”

Griffin এর মতে, “এক প্রস্থ বা এক জাতীয় অনেকগুলো বিকল্প থেকে একটি বিকল্প নির্বাচন করাই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ”

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে কতিপয় বিকল্প পন্থার মধ্য থেকে সর্বোৎকৃষ্ট একটি পন্থা বেছে নেয়াকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে একটি সামাজিক কর্ম প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল।

২। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর : প্রতিটি বিষয়ে কিছু কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। তেমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

১। পর্যায়ক্রমিক বা ধারাবাহিক : ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তসমূহ একসঙ্গে গ্রহণ করা হয় না। সিদ্ধান্তগুলো একটার পর একটা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হয় এবং সেটি প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধান কল্পে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয়।

২। পরিবর্তনশীল বা নমনীয় : প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। তাই পরিবর্তিত প্রক্রিয়া মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত : কোনো গৃহীত সিদ্ধান্ত অবশ্যই স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। যে-কোনো সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দের সঙ্গে জড়িত থাকে।

৪। সিদ্ধান্তে মূল বিষয় জড়িত : কোনো সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয় জড়িত থাকে। সিদ্ধান্ত কখনও প্রকাশ করা হয় আবার কখনও গোপন রাখা হয়।

৫। সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ : একাধিক বিকল্প হতে সর্বোত্তম বিকল্পটি গ্রহণ করাই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে বেশি লাভজনক। আমরা বলতে পারি যে, কোনো আদর্শ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর: সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাপনার একটি মৌলিক কাজ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অনেক লেখক বা তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন। ব্যবস্থাপনার সাফল্য অর্জন বহুলাংশে নির্ভর করছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতার উপর। সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিকগুলো নিচে বর্ণিত হলো-

১. সম্পদের সূষ্ঠ ব্যবহার: উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ, অর্থ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক উপকরণ দক্ষ লোকের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে সম্পদের সূষ্ঠ ব্যবহার এবং ফলপ্রসূ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

২. উদ্দেশ্য অর্জন: সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবসম্মত ও সঠিক কাজের গতিধারা নির্ধারিত হয়। সঠিক কার্যধারা নির্ধারণ সম্ভব হলে এর দ্বারা উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধি: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপককে সময়, মানবীয় আচরণ, যুক্তি, বাস্তবতা, সৃজনশীলতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। ফলশ্রুতিতে ব্যবস্থাপকের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জিত হয়।

৪. সম্পর্কোন্নয়ন: ব্যবস্থাপনা সাফল্য অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো শ্রমিক-মালিক তথা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত সকল পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও কার্যোপযোগী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে মত বিনিময়, পরামর্শ এবং পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক ও মানব সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়।

৫. সমস্যার সমাধান: সমস্যার সংজ্ঞায়নের উপর এর সমাধান অনেকাংশে নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং কাম্য পন্থা নির্বাচন সঠিক না হলে সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে পড়বে। সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করলে দ্রুত গতিতে ও ফলপ্রসূভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

৬. সঠিক কার্যধারা অনুসরণ: সঠিক সিদ্ধান্ত ব্যবসায়িক কার্যকলাপের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা, কার্যক্রমের ধারাবাহিক অনুক্রম ও গন্তব্যের সীমা নির্দেশ করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের সকল মানবীয়, বস্তুগত ও আর্থিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায়।

৭. ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির মতো বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে বিবেচনা করে ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর মতো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে শেখায়। এর ফলে ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটে।

৮. গতিশীলতা সৃষ্টি: সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি নৈমিত্তিক কাজ এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। নিয়মিত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে সমস্যার উদ্ভবের সাথে সাথে ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে উদ্যম ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৯. নিয়মিত প্রশিক্ষণ: দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী ও কর্মীদের অংশগ্রহণের দরুন অধীনস্থরা ব্যবস্থাপকীয় সমস্যা সমাধানের কলাকৌশল রপ্ত করতে পারে। ফলে সকল স্তরের নির্বাহী ও কর্মী ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কাজের ক্ষেত্রে কার্যকর ও বাস্তবমুখী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

১০. উপাদান চিহ্নিতকরণ: কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনের পথে প্রধান প্রধান ভূমিকা পালনকারী উপাদানগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। ফলে ব্যবস্থাপকগণ তাদের সম্পদ, উপকরণ, সময় ও প্রয়াস সেসব চিহ্নিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সেই ব্যবস্থাপকই সফল যিনি জানেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কিভাবে নিতে হয়। আর এর মাধ্যমে তিনি অধিকতর সফলতা, দক্ষতা ও গতিশীলতার সাথে সমস্যা মোকাবেলা করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব করে তোলেন।

২। সিদ্ধান্ত গ্রহণের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর: নিচে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:-

১। নিয়মিত সিদ্ধান্ত: যেসব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে প্রতিদিনই গ্রহণ করা অথবা নিয়মিত বিরতিতে গ্রহণ করা তাকে নিয়মিত সিদ্ধান্ত বলে।

২। অনিয়মিত সিদ্ধান্ত: যে সকল সিদ্ধান্ত নিয়মিত নেয়া হয় না অর্থাৎ বিশেষ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে নেয়া হয়, তাকে অনিয়মিত সিদ্ধান্ত বলে।

৩। আপদকালীন বা জরুরি সিদ্ধান্ত: যে সকল সিদ্ধান্তগুলো কেনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা দুর্যোগের কারণে নেয়া হয় তাকে আপদকালীন বা জরুরি সিদ্ধান্ত বলে।

৪। একক সিদ্ধান্ত: কোনো ব্যক্তি একাকী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাকে একক সিদ্ধান্ত বলে। যেমন-বিক্রয় ব্যবস্থাপক একক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এটি একটি একক সিদ্ধান্ত।

৫। দলীয় সিদ্ধান্ত: কয়েকজন ব্যক্তি মতো বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাকে দলীয় সিদ্ধান্ত বলে। যেমন-স্টদ উপলক্ষ্যে সকলেই ১ ঘন্টা ওভারটাইম কাজ করবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিটিং এর মাধ্যমে গৃহীত হলে তাকে দলীয় সিদ্ধান্ত বলা হয়।

৬। পৌনঃপুনিক সিদ্ধান্ত: যে সকল সিদ্ধান্ত নিয়মিত বা অনিয়মিত কিন্তু বার বার নিতে হয়, তাকে পৌনঃপুনিক সিদ্ধান্ত বলে।

৭। এককালীন সিদ্ধান্ত: যে সিদ্ধান্ত বার বার না নিয়ে একবারেই নেয়া হয় তাকে এককালীন সিদ্ধান্ত বলে। যেমন- নতুন একটি পণ্য বাজারে কী দামে বিক্রি করা হবে-এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি এককালীন সিদ্ধান্ত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিশেষে বলা যায়, সিদ্ধান্তের গুরুত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারাবাহিকতা ইত্যাদির আলোকে সিদ্ধান্তকে উপরিউক্ত ভাগে ভাগ করা গেলেও এর বাইরেও আরও অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত হতে পারে।

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সমস্যা আলোচনা কর।

উত্তর: ভূমিকা: কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করে। কতিপয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সফলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সমস্যা ৪ নিম্নে সফলতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা করা হলো:-

১। মূলধনের অপ্রতুলতা: প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয়সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পর্যাণ্ড মূলধনের উপর নির্ভরশীল। কেননা প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব না হলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বর্ধন কিংবা বিক্রয় প্রসার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তা ছাড়া আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও মূলধনের অপ্রতুলতার কারণে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনেক বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে।

২। কাঁচামালের অভাব: প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সাহায্যে ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে। কিন্তু উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট কাঁচামাল পাওয়া না গেলে কিংবা কাঁচামাল সংগ্রহ করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ফার্ম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে।

৩। অদক্ষ ব্যবস্থাপনা: প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে অদক্ষ ব্যবস্থাপকরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করতে পারেন না। এতে প্রতিষ্ঠানের ও পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পায় এবং প্রশাসনিক খরচ বাড়ে। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কিংবা স্থিতিশীলতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪। শ্রম অসন্তোষ: নানা কারণে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হতে পারে। শ্রমিক অসন্তুষ্টির কারণে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। ফলে পণ্যের গুণগত মান রক্ষা করে চাহিদামাফিক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। তা ছাড়া ক্রমবর্ধমানভাবে শ্রমিকদের অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকলে মালিকের সাথে শ্রমিকের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। ফলে ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদির মাধ্যমে ফার্ম এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

৫। ঝুঁকি গ্রহণে অনীহা: প্রতিষ্ঠান বর্তমানে যে অর্থ বিনিয়োগ করে তা হতে ভবিষ্যতে আয় অর্জিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ আয় অর্জনে ঝুঁকি ও অশিচয়তা বিরাজ করে। তাই অনেক প্রতিষ্ঠানের মালিক অধিক লাভজনক প্রকল্পেও বিনিয়োগ করতে চায় না। ফলে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাধাগ্রস্ত হয়।

৬। সমস্যা নির্ধারণে ত্রুটি: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিবর্গ সমস্যা নির্ধারণে অবহেলা করে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয় না। Anderson এর মতে, “সিদ্ধান্ত শনাক্তকরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।” ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৭। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব: সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর দূরদর্শিতার উপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়।

৮। জনশক্তির অভাব: দক্ষ, সৎ ও একনিষ্ঠ জনশক্তি যে-কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির অভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় না। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

৯। পরামর্শ গ্রহণে অনীহা: যৌথ আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে উত্তম ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এরূপ সিদ্ধান্ত সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধস্তনদের পরামর্শ না নিয়ে নির্বাহীরা এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে মূল সমস্যা এবং সমাধানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। ফলে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কার্য হাসিল করা সম্ভবপর হয় না।

১০। সহযোগিতার অভাব: পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে নির্বাহী অধস্তনের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তদরূপভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অধস্তনরা নির্বাহীকে সহযোগিতা প্রদান করে না। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সমস্যাসংকুল হয়ে পড়ে।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপরিউক্ত বিভিন্ন অসুবিধা বাধা হিসেবে দাঁড়ায়। ফলে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম্পিউটারের ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর : ভূমিকা : বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ। এ যুগে প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে কম্পিউটারের জয়জয়কার অবস্থা। এ অবস্থায় যে- কোনো কাজে কম্পিউটারের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। কম্পিউটারের ভূমিকা : নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম্পিউটারের ভূমিকা আলোচনা করা হলো-

১। তথ্য সংগ্রহে ভূমিকা : আমরা জানি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলভিত্তিই হলো তথ্য। এ সকল তথ্য সংগ্রহে কম্পিউটারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে কম্পিউটারে ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে বিশ্বের যে-কোনো স্থান হতে কম খরচে এবং অতিদ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২। তথ্য সংরক্ষণ : সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে শুধু তথ্য সংগ্রহই করা যায় না দীর্ঘমেয়াদি এবং নিরাপদ সংরক্ষণও করা যায়। পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে কাজে লাগানো যায়।

৩। তথ্যের বিশ্লেষণ : কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্যগুলোকে অতি দ্রুততার সাথে এবং অতি অল্প সময়ে বিশ্লেষণ করা যায়। এরূপ বিশ্লেষণমূলক তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। যেমন- চলতি বছরে কোম্পানির প্রবৃদ্ধির হার কত তা কম্পিউটারের সাহায্যে আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যাবে।

৪। নিয়মিত সিদ্ধান্ত : কতকগুলো নিয়মিত সিদ্ধান্ত আছে যা কম্পিউটার নিজেই দিয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই কম্পিউটারের প্রোগ্রাম দেয়া থাকে। যেমন- প্রতি মাসে বেতন বাবদ কত টাকার প্রয়োজন তার সিদ্ধান্ত কম্পিউটার নিজেই দিতে পারে।

৫। সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা মূল্যায়ন : বর্তমানে অত্যাধুনিক কম্পিউটারের সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা কতটুকু তার গাণিতিক সম্ভাবনাও নির্ণয় করা যায়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহীতা প্রয়োজনে সিদ্ধান্তের পরিবর্তনও করতে পারে।

৬। অনিয়মিত ও আপদকালীন সিদ্ধান্তের ভূমিকা : অনিয়মিত ও আপদকালীন সিদ্ধান্তের জন্য কী কী তথ্য প্রয়োজন হতে পারে তার অনুমান করে এবং পরে তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। তা ছাড়া প্রয়োজনের সময় আরও তথ্য কম্পিউটারে সরবরাহ করে অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সিদ্ধান্তের ফলাফল কেমন হবে তা সহ নানা বিষয়ে কম্পিউটার বিচার- বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে ব্যাপক সহায়তা করে থাকে। মোটকথা, বর্তমানে কম্পিউটার ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

অধ্যায়-০৪: সংগঠন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। সংগঠন কী?

উত্তর: সাধারণত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিশেষায়িত উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয় সাধনকে সংগঠন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কতিপয় ব্যক্তি বা দল পারস্পরিক স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একটি সামাজিক পদ্ধতি ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ভিতর অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে সংগঠন বলে। সহজ কথায়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বা ততোধিক ব্যক্তি পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতিতে একত্রিত হয়ে কাজ করলে তাকে সংগঠন বলে। সংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

এল. এইচ. হেনী এর মতে, “কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ অংশ বা উপাদানসমূহকে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে।”

কুঞ্জ এবং ডোনেল এর ভাষায়, “সংগঠন হল একটি সম্পর্কের কাঠামো যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণাদি সমবেত হয় এবং সকল উপকরণাদিকে ঘিরে ব্যক্তির প্রচেষ্টাসমূহ সমন্বিত হয়।”

এস. পি. বিপ এর ভাষায়, “সাধারণ বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অনেকগুলো লক্ষ্য অর্জনে কার্যসম্পাদনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে একত্রিত করে সচেতনভাবে যে সামাজিক দল বা এককের সমন্বয় সাধন করা হয় তাকে সংগঠন বলে।”

উপরিউক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, সংগঠন হল প্রতিষ্ঠানের উপকরণাদি ও কাজকে বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্তকরণ, প্রত্যেকের জন্য পৃথকভাবে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানের উপর হতে নিচ পর্যন্ত প্রত্যেক কাজ বা বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ ও সমন্বয় সাধনের একটি প্রক্রিয়া, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি ও উপায় উপকরণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

২। তদারকি পরিসর কাকে বলে?

উত্তর: প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন নির্বাহীর অধীনে কার্যপরিধি অনুযায়ী কতজন কর্মী থাকবে তা নির্ধারণ করা ও তত্ত্বাবধান করাই হলো তদারকি পরিসর।

ফ্রাংলিন এর মতে, “যে-সব অধস্তন একজন ব্যবস্থাপকের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন, তাদের সংখ্যাকে তদারকি পরিসর বলে।”

J. P Pase-এর মতে, “যে কয়জন অধস্তনকে একজন নির্বাহী সার্থকভাবে পরিচালনা করতে পারে তার সীমাই হলো তত্ত্বাবধান পরিসর বা তদারকি পরিসর।”

সুতরাং বলা যায় যে, একজন নির্বাহীর অধীনস্থ সকল কর্মচারীর কার্য প্রত্যক্ষ করা ও পরিচালনা করাই হলো তদারকি পরিসর।

৩। কার্যভিত্তিক সংগঠন কাকে বলে?

যে সংগঠন কাঠামোতে কাজকে প্রকৃতি অনুযায়ী ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞ কর্মীদের ওপর সীমিত সরলরৈখিক কর্তৃত্ব সহযোগে অর্পণ করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে। সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনে লক্ষণীয় যে, সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য এক বা একাধিক পদস্থ, সহযোগী বা বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। উদ্দেশ্য থাকে উভয় ধরনের কর্মী বা নির্বাহীগণ মিলে-মিশে দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, উভয় ধরনের নির্বাহীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির কারণ হয়। সকল কর্তৃত্ব সরলরৈখিক নির্বাহীর থাকায় অনেক সময় যোগ্য বিশেষজ্ঞ সহকারী তার দ্বারা উপেক্ষিত হয়। এতে বিশেষজ্ঞ কর্মী হতাশ থাকেন এবং তার নিয়োগের উদ্দেশ্যই অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই কার্যভিত্তিক সংগঠন কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে। এফ. ডব্লিউ. টেলর এরূপ সংগঠন কাঠামোর উদ্ভাবক।

৪। কমিটি সংগঠন কি?

প্রতিষ্ঠান বা উর্ধ্বতনের পক্ষ থেকে অথবা আইন, বিধি বা গঠনতন্ত্রবলে বিশেষ কোনো কার্য সম্পাদনের ভার একাধিক ব্যক্তির ওপর অর্পিত হলে ঐ ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে কমিটি বলে। এরূপ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্কের কাঠামোর সৃষ্টি হয় তাকে কমিটি সংগঠন বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান বা আহবায়ক থাকেন। যিনি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন ও দায়িত্ব পালনে সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকে জোরদার করেন। প্রয়োজনে কমিটির একজন সদস্য সচিবও করা হতে পারে। যিনি সভাপতির নির্দেশমত প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করেন। তবে কমিটির সকল সদস্য কমিটির কাজে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমঅধিকার ভোগ করেন।

৫। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

উত্তর: নিচে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:-

পার্থক্যের বিষয়	আনুষ্ঠানিক সংগঠন	অনানুষ্ঠানিক সংগঠন
১। গঠন	নির্ধারিত নিয়মকানুন অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক সংগঠন গঠিত হয়।	কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা নিয়মকানুন ছাড়াই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গঠিত হয়।
২। নমনীয়তা	অনমনীয় ও স্থায়ী ব্যবস্থা, ইচ্ছা করলেও পরিবর্তন করা যায় না।	নমনীয় ও গতিশীল।
৩। সংগঠন তালিকা	আনুষ্ঠানিক সংগঠনের লিখিত সংগঠন তালিকা থাকতে পারে।	অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের লিখিত সংগঠন তালিকা থাকে না।
৪। কর্তৃত্বের প্রবাহ	আনুষ্ঠানিক সংগঠনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়।	অনানুষ্ঠানিক সংগঠনে কোনোপ্রকার কর্তৃত্ব বা দায়িত্বের সৃষ্টি হয় না।
৫। ভূমিকা পালন	আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক সংগঠনের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।	কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সংগঠন আনুষ্ঠানিক সংগঠনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয়।
৬। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব	কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সংগঠন সৃষ্টি হয়।	কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বন্টনের সাথে আনুষ্ঠানিক সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

৬। সংগঠন তালিকা বা চার্ট কী?

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে চিত্রের সাহায্যে বা লিখিত তালিকা আকারে সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগ বা উপ-বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবস্থানিক সম্পর্ক দেখানো হলে তাকে সংগঠন তালিকা বা সংগঠন চার্ট বলে। এটি সংগঠনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারস্পারিক সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত চিত্র বা তালিকা। এতে কে কার উপর বা নিচের পদে অধিষ্ঠিত, বিভাগ বা উপবিভাগ-ওয়ারি তা দেখানো হয়।

৭। সরলরৈখিক ও কার্যভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উত্তর: নিচে সরলরৈখিক ও কার্যভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	সরলরৈখিক সংগঠন	কার্যভিত্তিক সংগঠন
১। সংজ্ঞাগত	যে সংগঠনের আদেশ, নিষেধ উপর থেকে ক্রমাগত নিচের দিকে আসে তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে।	যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হয় তাকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে।
২। সম্পর্কের ধরণগত	সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে খাড়াখাড়ি সম্পর্ক বিরাজমান।	কর্মকর্তাদের মধ্যে খাড়াখাড়ি ছাড়াও সমান্তরাল সম্পর্ক বিরাজমান।
৩। বিশেষ জ্ঞানগত	কর্মীদের একই সময় নানা ধরনের কাজ করতে হয় বলে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারে না।	কর্মীরা একই প্রকৃতির কাজ বার বার করে বলে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে।
৪। কার্যক্ষেত্রগত	ছোট আকারের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য।	মাবারি ও বড় আকারের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য।
৫। সময়গত	সময় বেশি প্রয়োজন হয়।	অপেক্ষাকৃত সময় অনেক কম লাগে।

উপরোক্তভাবে আমরা সরলরৈখিক ও কার্যভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

৮। সংগঠন কাঠামো কী?

উত্তর: অভিপ্রেত উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে কারবার প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য যে কাঠামো রচনা করা হয়, তাকে সংগঠন কাঠামো বলা হয়। সংগঠন কাঠামো একপ্রকার ব্যবস্থা বা হাতিয়ার। এটা কর্মকর্তা ও কর্মীদের কাজের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংগঠনের সদস্যগণকে কোথায়, কার উপর কর্তৃত্ব করবে অর্থাৎ কর্মীদের কর্তৃত্বরেখা সংগঠন কাঠামোতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতে হবে। এতে একটা সাংগঠনিক অবয়ব সৃষ্টি হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ সংঘবদ্ধভাবে সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করবে।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। সংগঠনের গুরুত্ব বা উপকারিতা আলোচনা কর।/একটি প্রতিষ্ঠানের উত্তম সংগঠন কাঠামো কেন প্রয়োজন হয়।

উত্তর: সংগঠনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: মানব শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য কর্মীর উপর ন্যস্ত করা হয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী এবং সচেতন বিধায় সে পূর্ণ শক্তি, দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে কার্যসম্পাদন করতে পারে। এতে মানব শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।

১. উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা: সংগঠন উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে সহায়তা করে। সংগঠন কার্যবিভাগের মাধ্যমে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়, উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় নির্দেশ করে এবং অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে। এর ফলে উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়।

২. উপকরণের কাম্য ব্যবহার: কার্যকর সংগঠনের মাধ্যমে মানবীয় ও অমানবীয় সকল উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সংগঠন বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যবন্টনের ব্যবস্থা করে। এটি যে কাঠামো তৈরি করে দেয় তার ফলে জনশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৩. মানব শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার: প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য কর্মীর উপর ন্যস্ত করা হয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী এবং সচেতন বিধায় সে পূর্ণ শক্তি, দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে কার্যসম্পাদন করতে পারে। এতে মানব শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।

৪. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: কার্য বন্টন সঠিকভাবে না হলে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা দেখা দেয়। সুসম সংগঠনে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত থাকে। কে কতটুকু দায়িত্ব পালন করবে, কে কার নিকট জবাবদিহি করবে ইত্যাদি সুস্পষ্ট থাকে বিধায় কার্যক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. বিশেষীকরণের সুবিধা: সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলি এদের প্রকৃতি অনুযায়ী বা সুবিধাজনকভাবে বিভাজন করা হয়। কার্যকর শ্রমবিভাগ প্রতিষ্ঠার ফলে নির্বাহীগণ ও কর্মীগণ দক্ষভাবে এবং মিতব্যয়িতা ও সাফল্যের সাথে কার্য সম্পাদন করেন।

৬. সমন্বয় সাধনে সহায়তা: প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে নিয়োজিত কর্মীদের উপর অর্পণ করা হয়। ফলে প্রতিটি কর্মী অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রেখে কার্যসম্পাদন করে।

৭. উৎপাদন বৃদ্ধি: সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা মানবীয় এবং অমানবীয় উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। এতে উৎপাদনের উপকরণের কোনোরূপ অপচয় হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৮. নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা: সংগঠনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ করা হয়। এতে কেউ দায়িত্ব অবহেলা করলে সহজে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে শাস্তির ভয়ে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে মনোনিবেশ করে। ফলে সংগঠনে সঠিক ও আদর্শ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

৯. সহযোগিতা বৃদ্ধি: দায়িত্ব-কর্তব্যসহ সংগঠন কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা দান করে। এতে সংগঠনে নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয়।

১০. পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি: সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নকালে প্রতিটি স্তরে নির্বাহীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় প্রতিটি নির্বাহী তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। এতে নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কোনো অবকাশ থাকে না। ফলে সকলের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্তভাবে আমরা সংগঠনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারি।

২। সংগঠনের আদর্শ/মূলনীতি বা নীতিমালার বিবরণ দাও।

উত্তর: সুষ্ঠু সাংগঠনিক কার্যসম্পাদনের জন্য যেসব আদর্শ অনুসরণ করতে হয় সেগুলোকে সংগঠনের নীতিমালা বা নিয়ম নীতি বলা হয়। সংগঠনের নীতিমালাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১. লক্ষ্যের নীতি: কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠায় একজন সংগঠনকে প্রথমেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হয়। লক্ষ্য যেমন হবে সংগঠনকেও সেভাবেই গড়ে তোলা আবশ্যিক। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এ কারণেই সংগঠন কাঠামোতে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

২. দক্ষতার নীতি: যে কোন ক্ষেত্রে সংগঠন প্রতিষ্ঠায় দক্ষতার বিষয়টি সবসময়ই সামনে রাখতে হয়। যেখানে যেসব বিভাগ খোলা প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রত্যেকের জন্য যেভাবে নির্ধারণ করা উচিত, সম্পর্কে যেভাবে ঠিক করে দেওয়া আবশ্যিক তা যদি করা না যায়, তাহলে পরবর্তী সময়ে যত নিষ্ঠাসহকারে কাজ করা হোক না কেন দক্ষতাসহকারে তা সম্পাদন ও কাজিত ফল লাভ সম্ভব হয় না।

৩. শ্রমবিভাজনের নীতি: প্রতিষ্ঠানের সংগঠন প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান কাজ হল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও কাজের ধরন অনুযায়ী কাজগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত ও বিভাজন করা। এর আলোকেই প্রতিষ্ঠানে বিভাগ ও উপবিভাগ খোলা হয় এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব আরোপিত হয়।

৪. কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ণয়ের নীতি: প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত প্রত্যেক নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকগণ প্রত্যক্ষভাবে কতজন অধস্তনের কাজ তত্ত্বাবধান করবেন তা সংগঠন কাঠামোতে নির্দিষ্ট করা হয়। এক্ষেত্রে একজন নির্বাহীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এমন পরিমাণ নির্বাহীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা উচিত যাতে তার পক্ষে অধস্তনদের কাজ সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা যায়।

৫. জোড়া-মই শিকলের নীতি: নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী সংগঠনে জোড়া-মই শিকলের নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রত্যেক বিভাগ, উপবিভাগ ও ব্যক্তির কাজকে এমনভাবে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে কেউই এর বাইরে না থাকে। এরূপ শিকল প্রতিষ্ঠার ফলে এর বাস্তবায়ন সহজ হয় এবং দলীয় প্রচেষ্টা জোরদার হয়।

৬. দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণের নীতি: প্রতিটি সংগঠনে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকা আবশ্যিক। প্রত্যেকেই যেন জানতে পারে তার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমা কতদূর। প্রতিষ্ঠানের উপরিস্তরের নির্বাহীদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বেশি হয় এবং ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে তা কম হতে থাকে।

৭. কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সমতার নীতি: একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সমতা বিধান করা অপরিহার্য। কর্তৃত্ব বেশি অথচ দায়িত্ব কম থাকলে ব্যবস্থাপক সাধারণভাবে স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে।

৮. আদেশের ঐক্যের নীতি: প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি স্তরে আদেশের ঐক্য যাতে বজায় থাকে অর্থাৎ একজন অধস্তনের যাতে প্রত্যক্ষভাবে একজন মাত্র আদেশকর্তা (Boss) থাকে, কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সে বিষয়টি বিশেষভাবে নজর রাখতে হয়। একাধিক আদেশ দাতা থাকলে দ্বৈত অধীনতার সৃষ্টি হয় এবং সে অবস্থায় অধস্তনের পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না।

৯. সারল্য ও সুস্পষ্টতার নীতি: সংগঠন এমন হওয়া আবশ্যিক যাতে তা সহজ ও সরল হয়। এরূপ সংগঠন কাঠামো দেখে সংগঠনের ভিতরে ও বাইরের যে কেউ যেন এর স্তরবিন্যাস, কর্তৃত্ব রেখা এবং জনশক্তি ও বিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

১০. ভারসাম্যের নীতি: সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর প্রতিটি ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগের কাজের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করা আবশ্যিক। এমন যেন না হয় কেউ অধিক কর্মভারগ্রস্ত এবং কারও কাজ নেই। এ অবস্থা হলে প্রতিষ্ঠানের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কার্যকর সংগঠন সৃষ্টির ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন নির্বাহীদের উল্লিখিত নীতিমালা বিশেষভাবে অনুসরণ করা উচিত। অন্যথায়, ভবিষ্যৎ ফলপ্রসূতা অর্জনে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

৩। ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর: ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রধানত দুইভাবে ভাগ করা যায়:

ক. আনানুষ্ঠানিক সংগঠন খ. আনুষ্ঠানিক সংগঠন

ক. আনানুষ্ঠানিক সংগঠন: প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের আনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক হতে যে সংগঠনের সৃষ্টি হয়, তাকে আনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলে। কোনোরকম আনুষ্ঠানিক নিয়মপদ্ধতি ও নীতি ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে সংগঠন কর্মীদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি, ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে আনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

খ. আনুষ্ঠানিক সংগঠন: সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে এরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে। আনুষ্ঠানিক সংগঠন আবার চার প্রকার। যথা:-

১। সরলরৈখিক সংগঠন: কোনো প্রতিষ্ঠানের সরল রেখার আকারে অবস্থিত পদসমূহকে ক্ষমতার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরস্পর সাজিয়ে যে কাঠামো তৈরি হয়, তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে।

২। রৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন: সরলরৈখিক নির্বাহীদের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ কর্মী বা পদস্থ কর্মী সহযোগে যে নতুন ধরনের সংগঠন কাঠামো গড়ে উঠেছে, তাকেই রৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন বলে।

৩। কার্যভিত্তিক সংগঠন: কাজ বিভাজনের মাধ্যমে সামগ্রিক কাজ সম্পাদনকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলা হয়।

৪। কমিটি সংগঠন: কমিটি হলো কতিপয় ব্যক্তির একটি দল। যারা কিছু দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে অনেক সময় বিশেষ কাজ সম্পাদনে কমিটি গঠিত হয়।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

অধ্যায়-০৫: কর্মীসংস্থান
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। স্টাফিং বা কর্মীসংস্থান বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: সাধারণ অর্থে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠনের মানবসম্পদের প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে কর্মীসংস্থান বলে। ব্যাপক অর্থে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে কী ধরনের কত সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হবে তা নির্দিষ্টকরণ সে অনুযায়ী যথাযথ উৎস বাছাই করে তা থেকে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন এবং তাদের যথাযথভাবে কাজে লাগানো জন্য প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াকেই কর্মীসংস্থান বলে।

নিম্নে কর্মীসংস্থানের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

J.L. Massie- বলেন, “স্টাফিং প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যবস্থাপক অধীনস্থ কর্মী নির্বাচন প্রশিক্ষণ পদোন্নতি ও অবসরদান করেন।”

R.M. Hodgetts-এর মতে, “কর্মীসংস্থান প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়।”

আইরিচ ও কুঞ্জ-এর মতে, “সংগঠন কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের শূন্যস্থান পূরণ এবং নিয়োগকৃত কর্মীদের যথাস্থানে সংরক্ষণ করাই হলো কর্মীসংস্থান।”

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জনশক্তি। কর্মীসংস্থানের মাধ্যমে এ উপাদানের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ সংগ্রহ নির্বাচন ও নিয়োগ উন্নয়ন বা পরিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পদোন্নতি পদাবনতি বদলি অবসর দান পভৃতি কার্যাবলি সম্পাদনা করা হয়।

২। কর্মীসংগ্রহ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কর্মীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে কর্মে আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়াকে কর্মী সংগ্রহ বা কর্মী প্রবেশন বলে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একদল দক্ষ ও উদ্যমী কর্মীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও উদ্যমী কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত উৎস অনুসন্ধান করতে হয় এবং বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। এ প্রক্রিয়াই কর্মী সংগ্রহ। কর্মী সংগ্রহ কি সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিচে এরকম যুগোপযোগী দুটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

আর, ডাব্লিউ. গ্রিফিন -এর মতে, “খালি পদে উপযুক্ত ব্যক্তিদের আবেদনের জন্য আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়াই কর্মী সংগ্রহ।”

এডউইন বি. ফ্লিপো -এর মতে, “কর্মী সংগ্রহ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সম্ভাবনাময় কর্মীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য আবেদন করতে অনুপ্রাণিত করা হয়।”

অতএব উপরিউক্ত সংজ্ঞাদ্বয় বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত উৎস থেকে যোগ্য, উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় কর্মী অনুসন্ধান করে প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োগ লাভের জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয় তাকে কর্মী সংগ্রহ বলে।

৩। কর্মী নির্বাচন বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: কর্মী নির্বাচন বলতে কোন প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মী নিয়োগদানের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে সম্ভাব্য কর্মীদের মধ্য থেকে যোগ্য কর্মী বাছাই কার্যক্রমকেই কর্মী নির্বাচন বলে। সম্ভাব্য কর্মীদের খুঁজে বের করে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, উদ্যম, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্মীদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগদানের লক্ষ্যে উত্তম কর্মী বাছাইয়ের জন্য যেসব কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তার সামগ্রিক প্রক্রিয়াই কর্মী নির্বাচন। উল্লেখ্য, পদোন্নতি, বদলি, বহিষ্কার, ছাঁটাই ইত্যাদি যে কাজের কাজের সাথেও কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া জড়িত। কর্মী নির্বাচন সম্পর্কে দুটি সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল :

১. ভ্যান ফ্লিট (Van Fleet) এর মতে, “কর্মী নির্বাচন হচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্য হতে সর্বোত্তম কর্মী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া”।

২. আর. এম. হডগেটস্ এর মতে, “কর্মী নির্বাচন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান কোন পদের জন্য আবেদনকারীদের মধ্য হতে সর্বোত্তম প্রার্থীদেরকে বাছাই করে”। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যোগ্য কর্মী বাছাই করার প্রক্রিয়াকে কর্মী নির্বাচন বলে।

৪। কর্মীসংগ্রহ ও কর্মীনির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদানের লক্ষ্যে প্রতিভাবান, উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় কর্মী খুঁজে বের করে তাদেরকে চাকরিতে উৎসাহিত করার জন্য যে প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাকে কর্মীসংগ্রহ বলে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রতিভাবান ও উদ্যমশীল কর্মীদের মধ্য হতে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যথাপযুক্ত কর্মী বাছাই করাই কর্মী নির্বাচন। ‘কর্মী সংগ্রহ’ ও ‘কর্মী নির্বাচন’ শব্দ দুটো প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলঃ

পার্থক্যের বিষয়	কর্মীসংগ্রহ	কর্মী নির্বাচন
১। সংজ্ঞাগত	প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কর্মীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে কর্মে অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়াকে কর্মী সংগ্রহ বলে।	প্রতিষ্ঠানের নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করে সম্ভাব্য কর্মীদের মধ্য থেকে যোগ্য ও উদ্যমী কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক কোন উৎস নেই। নির্বাচনের যেসব আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হতে দক্ষ কর্মী বাছাই করে নেয়া হয়।
২। পর্যায়	কর্মীসংগ্রহ কর্মী নির্বাচনের পূর্ববর্তী ধাপ।	কর্মী নির্বাচন কর্মীসংগ্রহের পরের ধাপ।
৩। উদ্দেশ্য	প্রতিষ্ঠানের কর্মীর চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মী খুঁজে বের করা।	সম্ভাব্য কর্মীদের মধ্য হতে যোগ্য কর্মী খুঁজে বের করার পর তাদেরকে যথাযথ পদে নিয়োগ দেওয়া।
৪। প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব	কর্মীসংগ্রহ প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কোন তেমন আর্থিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্বের সৃষ্টি হয় না।	নির্বাচিত কর্মীদের নিয়োগদানের পর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও সামাজিক দায় দায়িত্বের সৃষ্টি হয়।
৫। বিস্তৃতি	কর্মীসংগ্রহের পরিসরে সম্ভাবনাময় ও উপযুক্ত কর্মীগণ অন্তর্ভুক্ত হয়।	কর্মী নির্বাচনের আওতায় তাদের মধ্য হতে যোগ্য কর্মীরাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।
৬। আনুষ্ঠানিকতা	এটি কিছুটা অনানুষ্ঠানিক।	এতে বেশি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।
৭। পরীক্ষা	কর্মীসংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রার্থীর আগ্রহ যাচাই করা হয়।	কর্মী নির্বাচনের মাধ্যমে প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা, উদ্যম ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

উপরোক্তভাবে আমরা কর্মীসংগ্রহ ও কর্মীনির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

৫। কর্মীসংগ্রহের উৎসসমূহ কী?

উত্তর : কর্মী হলো প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মী প্রতিষ্ঠানকে সাফাল্যের কাছে নিয়ে যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান তার নিজের প্রয়োজনে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মী খুঁজে বের করে। কর্মী সংগ্রহে দুটি পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়। যথা-

(ক) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পদ্ধতি : প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের মধ্য হতে যে-সব কর্মী সংগ্রহ করা হয়, তাকে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পদ্ধতি বলে। যেমন-

১। কর্মরত কর্মীদের মধ্য থেকে দক্ষ ও যোগ্য কর্মীদের পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করা যায়।

২। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কর্মী কর্মরতদের সুপারিশ বা তাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্য থেকে পূরণ করা হয়।

৩। বড় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান শ্রমিকসংঘের সুপারিশমতো শ্রমীককর্মী নিয়োগ করা হয়।

(খ) বাহ্যিক সংগ্রহ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের বাহির হতে কর্মী নিয়োগ করে থাকে। যথা-

১। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাহির হতে কর্মী নিয়োগ করা হয়।

২। পূর্বে কর্মরত কর্মী হতেও অনেক সময় কর্মীর অভাব পূরণ করা হয়।

৩। মিডিয়ার মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৪। কারিগরি স্কুলগুলোও কর্মী সংগ্রহ করে থাকে।

উপরক্ত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ করে থাকে।

৬। প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত নতুন ও পুরাতন কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াই প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত পুরাতন ও নতুন কর্মীদের দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও প্রবণতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে যোগ্য কর্মী হিসেবে তৈরি করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন কর্মীকে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। এটি কর্মীর পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং কাজের প্রতি তাকে আগ্রহান্বিত করে তোলে।

প্রশিক্ষণ কি বা প্রশিক্ষণ কাকে বলে সে সম্পর্কে দুটো বাস্তবধর্মী সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো-

James Stoner এবং R. E. Freeman লেখকদ্বয়ের মতে, “প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা কর্মীর বহমান কর্মদক্ষতা সংরক্ষণ কিংবা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়।”

M. J. Jucious-এর মতানুসারে, “প্রশিক্ষণ একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে, যার মাধ্যমে কর্মীদের কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের আগ্রহ, দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হয়।”

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা, কর্মদক্ষতা ও উদ্যম বৃদ্ধি করে সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয় তাকে প্রশিক্ষণ বলে।

৭। পদোন্নতির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: যখন প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মীকে তার বর্তমান পদ হতে আরো অধিকতর উচ্চ দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পদে উন্নীত করা হয়, তখন তাকে পদোন্নতি বলে। পদোন্নতির ফলে কর্মীর মর্যাদা, আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। নিচে পদোন্নতির কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:-

পিগোর্স এবং মায়ার্স-এর মতে, “পদোন্নতি হলো একজন কর্মচারীর অপেক্ষাকৃত ভালো পদে উন্নীত করাকে বুঝায়।”

ক্রুডেন ও শেরম্যান-এর মতে, “পদোন্নতি হলো পদের পরিবর্তন। এ পরিবর্তন হলো সংগঠনের অভ্যন্তরে নিম্নপদ হতে উচ্চতর পদে পদায়ন।”

৮। জনশক্তি পরিকল্পনা কাকে বলে?

প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো মানব সম্পদ বা জনশক্তি। এজন্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় লোকবল বা জনশক্তি সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য যে মাধ্যমে জানা যায় সাধারণভাবে তাই জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা নামে পরিচিত। জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা হলো একটি পন্থা বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সঠিক সংখ্যক উপযুক্ত কর্মী সঠিক সময়ে ও সঠিক কাজে স্থাপন করা যায়। অর্থাৎ যে কাজের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যোগ্যতা সম্পূর্ণ কর্মীর পরিমাণ নির্ধারণ করে সময় মত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তাকে জনশক্তি মানব সম্পদ পরিকল্পনা বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের শূন্য পদগুলোর জন্য উপযুক্ত কর্মী পেতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় সে জন্য জনশক্তি / মানব সম্পদ পরিকল্পনা করা হয়। জনশক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য জনশক্তি পরিকল্পনা করা হয়। এ পরিকল্পনা দ্বারা প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা, যোগ্যতা, কর্মীর উন্নয়ন, কার্যকর ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়।

P. C Tripathi এর মতে, “প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ সংগ্রহ, উন্নয়ন, বিতরণ ও কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করার কর্মসূচি হলো মানব সম্পদ পরিকল্পনা।

William F. Gluek এর মতে, “জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর ব্যবস্থা করে।”

Stoner এর মতে, “প্রতিষ্ঠানের ভিতরের এবং বইরের বিভিন্ন উপাদান বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় কর্মী সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে জনশক্তি পরিকল্পনা বলে।”

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। প্রার্থী বাছাই বা কর্মীনির্বাচন পদ্ধতি/প্রকৃ্যাগুলো আলোচনা কর।

উত্তর: একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের জন্য কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি কি হবে তা যেমনি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিষয় তেমনটি তা পদের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বৃহদায়তন প্রায় সকল কারবারী প্রতিষ্ঠান সাধারণত নিম্নলিখিত নির্বাচন পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করে থাকে।

১। আবেদনপত্র গ্রহণ: ইহা নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ পূরণের জন্য কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উল্লেখপূর্ব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বা কর্মীর উৎসসমূহে যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রতিষ্ঠান চাকুরী প্রার্থীদের নিকট থেকে প্রচুর পরিমাণ আবেদন পত্র পেয়ে থাকে। যেমন বাংলাদেশ সিভিল-সার্ভিস এর বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনপত্র গ্রহণ।

২। প্রাথমিক পরীক্ষা: আবেদনকারীদের আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর প্রাথমিক সাক্ষাতকার বা প্রিলিমিনারী টেস্ট নেয়া হয়।

৩। লিখিত পরীক্ষা: এ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরকে সাধারণতঃ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। যেমন বি.সি.এস-এ প্রিলিমিনারী উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষায় ডাকা হয়।

৪। মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা: অনেক সময় বিভিন্ন সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা নিয়ে থাকে। যেমন বি.সি.এস-এ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা দেওয়া হয়।

৫। সাক্ষাৎকার: মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ড প্রার্থীর শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সম্পর্কে মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নেয়।

- ৬। প্রাথমিক নির্বাচন: পূর্বোক্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ কৃতিত্বের সাথে অতিক্রম করতে পারলে আবেদনকারীকে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করা হয়।
- ৭। শারীরিক পরীক্ষা: প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীকে শারীরিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।
- ৮। অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান: চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে প্রার্থীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানা হয়। সাধারণতঃ পুলিশ বিভাগ কর্তৃক প্রার্থীর অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়।
- ৯। চূড়ান্ত নির্বাচন: নির্বাচন প্রক্রিয়ার সব ধাপ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ আবেদনকারীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়।
- ১০। যোগদান: চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে যোগদান করতে বলা হয়। প্রার্থীকে কাজে যোগদান সংক্রান্ত একটি লিখিত যোগদানপত্র নিয়োগকারীর নিকট জমা দিতে হয়। বস্তুতঃ এভাবেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- উপরোক্তভাবে আমরা কর্মীনির্বাচন পদ্ধতি বা কর্মীবাহাই পদ্ধতির আলোচনা করতে পারি।
- ২। কর্মীসংস্থানের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
- কর্মীসংস্থানের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: নিচে কর্মীসংস্থানের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো:-
- ১। উদ্দেশ্য অর্জন: যে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শ্রমব্যক্তির প্রয়োজন যার ফলে একটি প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রমের শুরুতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।
- ২। উত্তম পরিবেশ: নির্ধারিত কাজের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানে কাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এমনকি কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও সম্প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠে।
- ৩। শৃঙ্খলা: শৃঙ্খলা যে কোন প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কর্মীসংস্থান প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- ৪। শূন্যপদ পূরণ: সাংগঠনিক কাঠামো বিনির্মাণের পর কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক শূন্যপদ তৈরি হয়। কর্মীসংস্থান প্রক্রিয়া শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করে শূন্যপদ পূরণ করে দেয়।
- ৫। অবিরাম উৎপাদন: প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই মূল কর্মশক্তি। কর্মীসংস্থান কাজেই প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত লোক নিয়োগের মাধ্যমে অবিরাম উৎপাদন কার্যক্রম চালাতে সক্ষম হবে।
- ৬। দক্ষতার সমাবেশ: কর্মীসংস্থান প্রার্থীর বাছাইয়ের মাধ্যমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ করতে পারে যা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।
- ৭। পারস্পরিক সম্প্রীতি: প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী সংগ্রহ ও যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয় আর এ জন্যই কর্মীদের মনে মনে ক্ষোভ বা দুঃখবোধ থাকে না ফলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা গড়ে উঠে।
- ৮। বাজারজাতকরণ প্রসার: একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চায় বর্ধিত চাহিদা সম্প্রসারিত বাজার। কেননা প্রসারিত বাজার বর্ধিত মুনাফার যোগান দেয়।
- ৯। সমৃদ্ধি অর্জন: একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী প্রাতিষ্ঠানিক সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। কর্মীসংস্থান যথাযথভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।
- ১০। প্রশিক্ষণ প্রদান: সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে কর্মীদের অধিকতর অবদান রাখার সামর্থ্য বৃদ্ধিই হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য।
- উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় কর্মীসংস্থান প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা উপযুক্ত কর্মীই প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ। কারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি ও সংরক্ষণ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।
- ৩। বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- উত্তর: নিচে প্রশিক্ষণ প্রদানের বর্ণনা তুলে ধরা হলো:-
- ১। শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ: এ পদ্ধতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির চুক্তির অধীনে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রতিষ্ঠান শিক্ষানবিস কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ এবং প্রশিক্ষণ লাভে সফল হলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান চাকরিতে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য থাকে।
- ২। সেমিনার: এতে বিশেষ উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে একাধিক অধিবেশনে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়। একেক অধিবেশনে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য পেশ বা লিখিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
- ৩। অধিবেশন: সুপারভাইজার এবং মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রশিক্ষণের এরূপ পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগী। আর এধরনের প্রশিক্ষণে একসাথে অনেক প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিতে পারে।
- ৪। ওয়ার্কশপ: এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক কোন বিষয় প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ছোট দলে আলোচনা করে এবং উক্ত বিষয়ে করণীয় নিজেরা প্রশিক্ষণস্থলে বসেই নির্ধারণ করার চেষ্টা করে।
- ৫। বিশেষ সভা: জরুরি বিশেষ সভা আহ্বান করে অংশগ্রহণকারীকে ব্যবস্থাপকের প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, কৌশল ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয় ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ৬। চলচ্চিত্র ও টিভি: এ পদ্ধতির মাধ্যমে দূরের এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে তাদের কাজের পদ্ধতি ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়।
- ৭। পদ পরিবর্তন: ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীদের মনোন্মুখনে পদ পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। আর এ পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মী বা নির্বাহীদেরকে প্রতিষ্ঠানের এক পদ থেকে অন্য পদে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হস্তান্তর করে বিভিন্ন কাজে পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করা হয়।
- ৮। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি: এটা অনেকটা শিক্ষানবিশ পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে নির্বাহীর অধীনে খুবই অল্পসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে রাখা হয়। এতে নির্বাহী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারে।
- ৯। বক্তৃতা পদ্ধতি: এতে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা কোন বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়।
- ১০। কোচিং: এ পদ্ধতিতে একজন সুপারভাইজার বা ব্যবস্থাপকের অধীনে কয়েকজন কর্মীদের নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এতে উর্ধ্বতন প্রশিক্ষণার্থীদের কী কাজ করতে হবে, কিভাবে করতে হবে তা বলে দেন এবং প্রশিক্ষণার্থীর নির্দেশিত পন্থায় কাজ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন।
- উপরোক্তভাবে আমরা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা আলোচনা করতে পারি।
- ৪। পদোন্নতির ভিত্তিসমূহ কী কী?
- উত্তর: কর্মীকে উচ্চস্তর পদে পদায়নের নামই হলো পদোন্নতি। পদোন্নতি ভিত্তি তিনটি। যথা:-

ক. জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি

খ. যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি এবং

গ. জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি

ক. জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি: যখন প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের বয়স বা তাদের চাকুরির সময়কাল ও অভিজ্ঞতা বা বর্তমান প্রতিষ্ঠানে চাকুরির মেয়াদ ইত্যাদি উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তখন তাকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি বলে।

খ. যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি: যখন কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, উপস্থিতির হার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তখন তাকে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি বলে।

গ. জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি: যখন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা উভয় বিবেচনাপূর্বক প্রদান করা হয়, তখন তাকে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি বলে। এ পদ্ধতি অধিক গ্রহণযোগ্য।

অধ্যায়-০৬: নির্দেশনা ও নেতৃত্ব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। নির্দেশনা কাকে বলে?

উত্তর: প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যে প্রক্রিয়ায় তাদের অধস্তন কর্মচারীদেরকে তাদের কাজ সম্পর্কে আদেশ উপদেশ, অনুরোধ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে তাকে নির্দেশনা বলে। নির্দেশনা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রকম মতামত ব্যক্ত করেছেন নিচে তা তুলে ধরা হলো:-

মার্শাল ই. ডিমোক এর মতে, “নির্দেশনা কার্যাবলি হচ্ছে প্রশাসনের হৃৎপিণ্ডের সাথে তুলনীয় এমন কার্যাবলি, যা কর্মপন্থা নির্ণয়, আদেশ ও নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি গতিশীল নেতৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

অধ্যাপক কুঞ্জ এবং ডোনেল বলেছেন, “নির্দেশনা হল ব্যবস্থাপনার আন্তঃব্যক্তিগত দিক যার মাধ্যমে বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে অবদান রাখার জন্য অধস্তনদের অবহিত করা হয়।”

অধ্যাপক নিউম্যান এর মতে, “নির্দেশনা হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন নির্বাহী তার অধীনস্তদের উপদেশ প্রদান এবং কর্মপন্থার ইঙ্গিত প্রদান করে থাকেন

জে. এল. ম্যাসি এর মতে, “নির্দেশনা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা প্রকৃত কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অধস্তনদের পদনির্দেশ দেওয়া হয়।”

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, নির্দেশনা বলতে প্রাতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মীদের নির্দেশ প্রদানকে বুঝায়। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ার মধ্যে আদেশ নির্দেশ প্রদান, পরামর্শ দান, নেতৃত্বদান তত্ত্বাবধান, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি কার্য ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং নেতৃত্বদানের এক গতিশীল প্রক্রিয়া।

২। “প্রশাসনের হৃৎপিণ্ড হলো নির্দেশনার কার্য”-আলোচনা কর।

উত্তর: নির্দেশনা বলতে এমন একটি আদেশ দানের বা নির্দেশ প্রদানের কৌশলকে বুঝানো হয়, যাতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অধস্তনদের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে উদ্দেশ্যানুযায়ী বাস্তবে রূপায়ন করেন। এক কথায় বলা যায়, এটি নির্দেশ প্রদানের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় নির্দেশ, আদেশ, উপদেশ, নেতৃত্বদান ইত্যাদি যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

একটি প্রতিষ্ঠানের গতি বা শক্তি হলো উত্তম নির্দেশনা। নির্দেশনাকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা যায়। অচল গাড়িকে সচল করতে ইঞ্জিনের ভূমিকা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের ক্ষেত্রেও নির্দেশনা তেমনিভাবে প্রাণসঞ্চর করে। এটি প্রশাসনের মূল উপজীব্য। ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নির্দেশনা অন্যতম। মার্শাল ই. ডিমোক নির্দেশনাকে প্রশাসনের হৃৎপিণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, “নির্দেশনা কার্য হলো প্রশাসনের হৃৎপিণ্ড, যা কর্মপন্থা নির্ধারণ, আদেশ ও নির্দেশ প্রদান এবং গতিশীল করা যায়। অর্থাৎ সমগ্র কার্যাবলিকে বাস্তবায়ন করার কার্যকর শক্তি হলো নির্দেশনা। সুতরাং কর্মীর প্রচেষ্টাকে পরিকল্পনামাফিক রূপায়িত করা, সঠিকভাবে নির্দেশ প্রদান, কর্মীদের প্ররোচিত করা, সময়মতো যোগাযোগ কার্য তদারক করা, নেতৃত্ব প্রদান করা ইত্যাদি প্রশাসনের মুখ্য বিষয়, যার প্রভাবে সংগঠনের প্রতিটি কার্য ও উদ্দেশ্য প্রভাবিত হয়। তাই বলা যায়, “প্রশাসনের হৃৎপিণ্ড হলো নির্দেশনা।”

৩। পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: যখন কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে নির্দেশনা দেওয়া হয়, তখন তাকে পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলে। আলোচনা করে সবার গ্রহণযোগ্য নির্দেশনাসমূহ ঠিক করা হয়। পরে এ নির্দেশনা লিখিত আকারে প্রেরণ করা হয়। পরামর্শমূলক নির্দেশনা সম্পর্কে Keith Davis বলেন, “সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কার্যের সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের প্রত্যাশায় অধস্তন কর্মীদেরকে সিদ্ধান্তগ্রহণে আমন্ত্রণ ও উৎসাহিত করে যে নির্দেশ প্রদান করেন, তাকে পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলে।”

এ ছাড়া স্বনামধন্য ব্যবস্থাপনা লেখক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য-এর মতানুসারে, “ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের পরামর্শক্রমে যে নির্দেশ প্রদান করা হয় তাকে পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলে।”

সুতরাং বলা যায়, পরামর্শমূলক নির্দেশনা হলো ব্যবস্থাপনার এমন একটি প্রক্রিয়া, যে ক্ষেত্রে নির্দেশনায় অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতামত গ্রহণপূর্বক যে নির্দেশনা প্রদান করেন তাকে পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলে।

৪। নেতৃত্বের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: ভূমিকা : নেতৃত্ব একটি সহজাত প্রক্রিয়া। নেতৃত্ব হচ্ছে নেতা কর্তৃক কোনো দলের উপর এমন ধরনের প্রভুত্ব যা দলের সদস্যবৃন্দ স্বৈচ্ছায় মেনে নেয়। অনুসারীবৃন্দ নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করলে নেতৃত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। দলের লক্ষ্য অর্জন এবং সুষ্ঠু পরিচালনায় নেতা যেসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন তাই নেতৃত্ব।

নেতৃত্ব : শাব্দিক অর্থে বাংলা ‘নেতৃত্ব’ শব্দটি ইংরেজি ‘Leadership’ শব্দের বাংলা প্রতিরূপ। নেতৃত্ব কথটির সাথে ‘নেতা’ (Leader) এবং কর্তৃত্ব বা আধিপত্য (Authority) এর বিষয়টি জড়িত। নেতৃত্ব মূলত একটি সামাজিক গুণ এর নৈতিক ক্ষমতা।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : নেতৃত্বের কোনো সঠিক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে নেতৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। লা পিয়ের এবং ফ্রান্সোয়ার্থ তাঁর ‘Social Psychology’ গ্রন্থে বলেন, “নেতৃত্ব হলো সেই আচরণ যা অন্যান্য ব্যক্তিদের আচরণকে অধিকতর প্রভাবিত করে, অথচ অন্যান্য ব্যক্তিদের আচরণ নেতাকে ততটুকু প্রভাবিত করে না।”

কিম্বল ইয়ং তাঁর ‘Handbook of P Psychology’ গ্রন্থে বলেন, “নেতৃত্ব হলো এক ধরনের প্রভাব বিস্তার, যেখানে অনুসারীরা কম বা বেশি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে।”

এইচ. ও. ডানেল বলেন, “সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে প্ররোচিত ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলা হয়।

জি. আর. টেরি এর মতে, “নেতৃত্ব হচ্ছে পারস্পরিক লক্ষ্য অর্জনে স্বেচ্ছায় সংগ্রাম করতে মানুষকে প্রভাবিত করার কার্যকলাপ।”

পরিশেষে বলা যায় যে, নেতৃত্ব বলতে আমরা কোনো ব্যক্তির সেসব নৈতিক গুণাবলি বুঝি, যা জনসমষ্টির বিশিষ্ট এক আচরণভঙ্গি সৃষ্টি করে এবং সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। নেতৃত্ব গড়ে ওঠে একজন ব্যক্তির আচরণ, ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলিকে কেন্দ্র করে।

৫। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব কাকে বলে?

উত্তর: সাধারণত গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা অংশগ্রহণকারীদের যথেষ্ট যুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন।

J. L Massie এর মতে, “গণতান্ত্রিক নেতা নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর না করে অধস্তনদের পরামর্শকে উৎসাহিত করেন।”

Bateman এর মতে, “গণতান্ত্রিক নেতা অধস্তনদের কাছ থেকে পরামর্শ আশা করে।”

সুতরাং বলা যায়, নেত যখন নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর পুরোপুরি নির্ভর করেন না, অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন, তখন তাতে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। উত্তম নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

নিচে উত্তম নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো:-

১। বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত: নির্দেশনা অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত হওয়া উচিত। অযৌক্তিক নির্দেশনা কর্মীদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। এতে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ এটা পালন করা অনেক সময় কর্মীর পক্ষে সম্ভব হয় না।

২। সহজ ও সুস্পষ্টতা: নির্দেশনা সহজ ও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। সহজ ও সরল ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করা উচিত। নির্দেশনার কারণ যদি কর্মীদের জানা থাকে, তাহলে নির্দেশ পালনের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩। সংক্ষিপ্ততা: উত্তম নির্দেশনা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তব্যপূর্ণ নির্দেশনা অধস্তনদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ব্যবসায় জগতে সময়ের মূল্য খুব বেশি। তাই নির্দেশনার মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করা উচিত।

৪। লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়: মানুষের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। তদুপরি ভুল বুঝাবুঝি বা অস্পষ্টতা দূর করার জন্য নির্দেশনা লিখিত হওয়া উচিত। ইচ্ছা করলেও লিখিত নির্দেশনা বিকৃত বা পরিবর্তন করা যায় না। কারণ এটা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

৫। নিম্নগামীতা: নির্দেশনা সর্বদা নিম্নগামী হবে। কারণ অধস্তন তার বসের উপর নির্দেশ জারি করতে পারে না।

৬। সময়সীমা: একটি আদর্শ নির্দেশনামায় এর সম্পাদনের সময়সীমা উল্লেখ থাকা উচিত। তা ছাড়া যথাসময়ে নির্দেশ প্রদান করা উচিত। সময়মতো নির্দেশনা কর্মীদের নিকট না পৌঁছালে তা থেকে ভালো ফল আশা করা যায় না।

৭। পরিপূর্ণতা: নির্দেশনা পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত। কী করা হবে, কেন করা হবে, কীভাবে কথা হবে, ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব একটি উত্তম নির্দেশনামায় প্রদান করা উচিত।

৮। প্রাসঙ্গিকতা: উত্তম নির্দেশনার একটি অন্যতম গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো প্রাসঙ্গিকতা। নির্দেশনা অবশ্যই অধস্তনদের কার্যের বা দায়িত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে নির্দেশনা কখনই কার্যকরী করা যায় না।

৯। একক বিষয়বস্তু: একটি নির্দেশ কেবল একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যিক। এটি উত্তম নির্দেশনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একটি নির্দেশ একাধিক বিষয় টেনে আনলে কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

১০। নিরবিচ্ছিন্নতা: নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ নির্দেশনা এমনভাবে প্রদান করা উচিত, যাতে একটি নির্দেশ বাস্তবায়নের সাথে সাথে কর্মী আরেকটি নির্দেশ পায়। নির্দেশনার ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে নির্দেশ পালনের ব্যাপারে অধস্তনদের মধ্যে ঊদাসীন্য ভাব দেখা দেয় এবং কাজ ফাঁকি দেওয়া প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

উপরোক্তভাবে আমরা উত্তম নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারি।

২। নির্দেশনার গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন হয়। এ কারণে নির্দেশনার গুরুত্ব অনেক বেশি। নিচে নির্দেশনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো।

১। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যসূচির রূপরেখা। প্রতিষ্ঠানে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বা শীর্ষ ব্যবস্থাপকগণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন। প্রণীত পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরই এর যথার্থতা নির্ভর করে। পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে তার অধীনস্থ কর্মীদেরকে কখন, কী কাজ, কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ প্রদান করতে হয়।

২। সংগঠনের কার্যকারিতা: সংগঠন হচ্ছে উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম বা উপায়, যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের আলোকে কাজের শ্রেণিবিভাগ, কাজের বিভাগীকরণ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বন্টনের সাথে সম্পৃক্ত। সংগঠনকে কার্যকর করতে হলে নির্দেশনা একান্ত অপরিহার্য। নির্দেশনার মাধ্যমেই প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কর্তৃত্ব তাকে অবহিত করানো হয়।

৩। কর্মীর যোগ্যতা বৃদ্ধি: কর্মীরা নির্দেশনার মাধ্যমে কীভাবে কার্যসম্পাদন করবে তা উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট হতে জানতে পারে। ফলে কাজে ভুলত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪। কর্মীদের কাজের তত্ত্বাবধান: নির্দেশনা কর্মীদেরকে শুধু কার্যসম্পাদনের আদেশ-নির্দেশই প্রদান করে না, এটা কর্মীদের কাজও তত্ত্বাবধান করে। কর্মীরা প্রত্যাশিত উপায়ে কাজ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে ভুলত্রুটি থাকলে সঠিক পথনির্দেশ দেয়াও নির্দেশনার কাজ।

৫। প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা বৃদ্ধি: নির্দেশনা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যপ্রবাহে নির্দেশনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় উর্দ্ধতন কর্মকর্তা অধস্তনদের ব্যবসায়ের কার্যসম্পর্কিত বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ জারি করে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে সচলতা আনয়ন করে।

৬। প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা আনয়ন: নির্দেশনা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা আনয়ন করে। কার্যকর নির্দেশনার মাধ্যমে কর্মীরা তাদের কার কী কাজ, কার্যসম্পাদনের পন্থা বা উপায়, কার্যসম্পাদনের সময় ইত্যাদি সঠিকভাবে অবহিত হয়ে সেই অনুযায়ী কাজ চালাতে সক্ষম হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৭। প্রেষণা দান: নির্দেশনা শুধু নির্দেশ বা উপদেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হয় না, কর্মীদের কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন প্রেষণাও প্রদান করে থাকে।

৮। উর্দ্ধতন-অধস্তন সুসম্পর্ক সৃষ্টি: নির্দেশনার ফলে নির্বাহী ও অধস্তন সম্পর্ক মধুর হয়, নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। তারা পরস্পরের সন্নিহনে আসার সুযোগ পায়। এতে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পায়, যা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে।

উপসংহার : পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, নির্দেশনার অবদান সুদূরপ্রসারী। নির্দেশনার অভাবে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলিও স্থবির ও নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়।

৩। নির্দেশনার ধরন বা প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর: ব্যক্তিকে জীবন সার্থক করে তুলতে নির্দেশনা বিভিন্ন প্রকার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এই বিভিন্ন প্রকার ভূমিকার জন্য ব্যক্তিজীবনে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনার। নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তি সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করে তার সমাধানের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাই ব্যক্তিজীবনে নির্দেশনা বিভিন্ন প্রকারের। বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনাগুলি হল -

১. শিক্ষামূলক নির্দেশনা :- শিক্ষা মানুষকে জীবনে অভিযোজন ঘটাতে সাহায্য করে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাগুলি শিক্ষার মাধ্যমে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে ও তার প্রতিকারের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান সময়ে শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে।

২. বৃত্তিগত নির্দেশনা :- যে ধরণের নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার বৃত্তির সঙ্গে অভিযোজন ঘটায় এবং অভিযোজনে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে তাকে বৃত্তিগত নির্দেশনা বলে। বৃত্তিগত নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তি তার চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩. সামাজিক নির্দেশনা :- সামাজিক নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব। সামাজিক সম্পর্ক ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয় - বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনে অংশগ্রহণ করা - ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক নির্দেশনা ব্যক্তিকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৪. নৈতিক নির্দেশনা :- মানব জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ স্থাপন, ঠিক - ভুলের জ্ঞান, অবাঞ্ছিত আচরণ প্রতিহত করা - ইত্যাদি হল নৈতিক নির্দেশনার লক্ষ্য। নৈতিক নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে - অপরাধমূলক কাজ, সমাজবিরোধী কাজ, নেশাগ্রস্থতা - ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা সম্ভব। এছাড়াও নৈতিক নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সুচরিত্র গঠনে সহায়তা লাভ করে।

৫. ধর্মীয় নির্দেশনা :- ধর্ম মানুষের সামাজিক, আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রধান উপাদান। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে ধর্ম অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তি ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ, ধর্মের বিভিন্ন উপাদান - ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। ধর্মীয় নির্দেশনার প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মধ্যে থাকা কুসংস্কারগুলিকে দূর করে নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সমাজজীবনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা।

৬. পারিবারিক নির্দেশনা :- প্রতিটি সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির কিছু সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে পারিবারিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। পারিবারিক নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পর্কে অবগত করে তোলা সম্ভব হয়।

৭. অবকাশ যাপনের নির্দেশনা :- প্রতিটি মানুষের জীবনে অবকাশ যাপন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই অবকাশ যাপনকে যদি গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে পরিচালিত করা যায় তাহলে তা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয়। অবকাশ যাপনের নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সৃজনশীল কাজ, সেবামূলক কাজ - ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে তোলা সম্ভব।

৮. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশনা :- সুস্থ দেহ ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষেই যথার্থভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়। সমাজের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন ও জীবনের লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য সুস্থ দেহ একান্তভাবে কাম্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবগত করা যায়; বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যায়, বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি ও টীকাকরণ - ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত করে তাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, যেহেতু নির্দেশনা ব্যবস্থাপনায় একটি মৌলিক কার্য হিসাবে বিবেচিত তাই এর সফলতা অর্জনের উপর ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভরশীল।

৪। ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর।

নেতৃত্বের গুরুত্ব আলোচনা: একটি প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ও সফল নেতৃত্ব ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন সম্ভব হয় না। নিম্নে ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

মূলত ব্যবস্থাপনা হল এক বিশেষ প্রকারের নেতৃত্ব দান; কর্মীদেরকে একত্রিত করার ক্ষমতাই হল নেতৃত্ব। নিম্নে ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

১. সংঘবদ্ধতা সৃষ্টি: ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তিকে সংঘবদ্ধভাবে পরিচালনা করা। কারণ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত কখনও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন করা সম্ভবপর হয় না। প্রতিষ্ঠানে কার্যকর মানের নেতৃত্ব থাকলে তাকে ঘিরে অধস্তন জনশক্তি সংঘবদ্ধ ও আবর্তিত হয়।

২. দলবদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদার : দলীয় প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পরিচালনা করাই মূলত নেতার কাজ। এরূপ প্রচেষ্টা বিশেষ করে নেতার নিজস্ব গুণ ও কর্মদক্ষতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা সৃষ্টি ও জোরদারকরণের ক্ষেত্রে সুদক্ষ নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই বললেই চলে।

৩. নমনীয়তা বৃদ্ধি: সাধারণত পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনাকে অনেক সময়ই গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন আনয়ন করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে যে কোন ধরনের পরিবর্তন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীরা সহজে মেনে নিতে চায় না। এমতাবস্থায়, যোগ্য নেতৃত্ব এক্ষেত্রে কর্মীদের মনোভঙ্গিতে সহজেই পরিবর্তন এনে প্রাতিষ্ঠানিক নমনীয়তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. সম্পর্কের উন্নয়ন: প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর সহযোগিতার বিষয়টি বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়। ব্যবস্থাপনা দুর্বল হলে তা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। ফলে তা হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে ও যে কোন সমস্যার সহজ সমাধানে ব্যর্থ হয়।

৫. শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক : যেহেতু উত্তম নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতার সাথে কার্যসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভবপর হয়, তাদের যে কোন সমস্যা দ্রুততার সাথে সমাধানের উদ্যোগ করা হয় এবং তাদের কার্যক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ প্রদান করা হয়; সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠানে শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

৬. সহযোগিতার উন্নয়ন : যে কোন ব্যবসায় সংগঠনে কর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া লক্ষ্যার্জন সম্ভবপর হয় না। কার্যকর নেতৃত্ব সংগঠনের অভ্যন্তরে এরূপ সহযোগিতা উন্নয়নে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নেতৃত্বকে ঘিরেই জনশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় কার্যসম্পাদন করে।

৭. লক্ষ্যার্জনে সহায়তা দান: কার্যকর নেতৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ নেতৃত্ব হল এমন একটি কৌশল, যার ফলশ্রুতিতে দলীয় সদস্যরা তাদের সর্বোচ্চ স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনে সামর্থ্য অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে তৎপর হয়।

৮. মনোবল উন্নয়ন: ব্যবস্থাপনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কর্মীদের স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত করে স্বতঃস্ফূর্ত কাজ আদায় করা। এক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নেতৃত্ব যোগ্য হলে তার অধীনে কাজ করতে কর্মীরা সবসময়ই উৎসাহ বোধ করে এবং তাদের মনোবলও উন্নত থাকে। কর্মীদের উচ্চ মনোবল ও উত্তম কারবারি পরিবেশ সৃষ্টিতেও নেতৃত্ব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনার থেকে পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক জটিল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন ও লক্ষ্যার্জনে নেতৃত্ব অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৫। নেতৃত্বের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর: নেতাকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এর ফলে তার আচার-আচরণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নিচে নেতৃত্বের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো:

ক. আনুষ্ঠানিকতাভিত্তিক নেতৃত্ব: আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে নেতৃত্বকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব : এ ধরনের নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিক কাঠামো থেকে সৃষ্ট। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ ক্ষমতার বলে একজন ব্যক্তি অধস্তনদের নেতা হিসেবে গণ্য হন। একটি কলেজের অধ্যক্ষ এ ধরনের নেতৃত্বের উদাহরণ। অনেকটা পদাধিকার বলে এ ধরনের নেতার জন্ম হয়।

২. অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব: আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বাইরেও যে নেতৃত্ব গড়ে উঠে তাকে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বলা হয়ে থাকে। অনানুষ্ঠানিক নেতাদের কোন বিধিবদ্ধ ক্ষমতা থাকে না। তারা তাদের ব্যক্তিত্ব দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করেন।

খ. প্রেষণাভিত্তিক নেতৃত্ব: প্রেষণাভিত্তিক নেতৃত্ব দু' ধরনের:

১. ইতিবাচক নেতৃত্ব: যে ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদেরকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করেন, তাকে ইতিবাচক নেতৃত্ব বলা হয়। ভাল কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে ও পুরস্কার প্রদানের ফলে কর্মীরা তাদের কার্যে অধিক মনোনিবেশ করে।

২. নেতিবাচক নেতৃত্ব : এ জাতীয় নেতৃত্ব কর্মীদেরকে ভয়-ভীতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অবহেলা বা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ জাতীয় নেতৃত্বে কর্মীরা কর্ম সম্পাদনে অধিক সাবধানী হয়ে থাকে।

গ. ক্ষমতাভিত্তিক নেতৃত্ব: নেতার ক্ষমতা প্রয়োগের ভিত্তিতে নেতৃত্বকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. স্বৈরাচারিক বা স্বৈচ্ছাচারী নেতৃত্ব : নেতা যখন অনুসারীদের সাথে স্বৈচ্ছাচারমূলক আচরণ করেন তখন তার নেতৃত্বকে স্বৈচ্ছাচারী নেতৃত্ব বলে। স্বৈচ্ছাচারী নেতা ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখেন, সিদ্ধান্তগ্রহণে কর্মীদের অংশ নেওয়ার সুযোগ দেন না বরং নিজের সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেন। নেতার ইচ্ছানুসারে কাজ না করা হলে কর্মীদের শাস্তির ভয় দেখান কিংবা চাকরিচ্যুত করেন। তবে এরূপ নেতৃত্বের প্রধান সুবিধা হল, এতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

২. অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব : যে ধরনের নেতৃত্বে কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব বলে। এরূপ নেতৃত্বের সুবিধা হলো, কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকে এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ে। তবে সিদ্ধান্তগ্রহণ বিলম্বিত হয়।

৩. অবাধ বা লাগামহীন নেতৃত্ব : যে নেতৃত্বে নেতা বা ব্যবস্থাপক নিজের ক্ষমতা নিচের স্তরের বিশৃঙ্খল কর্মীদের স্ব-স্ব কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেন, তাকে অবাধ নেতৃত্ব বলে। একে মুক্ত নেতৃত্বও বলা হয়। এক্ষেত্রে নেতা ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিহার করে চলেন, কর্মীদেরকেই তাদের সমস্যা সামাল দেবার পরামর্শ দেন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে নেতা তেমন ভূমিকা গ্রহণ করেন না। কর্মীদের যোগ্যতার উপর অবাধ নেতৃত্বের সাফল্য নির্ভর করে। সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব ঘটলে এ ধরনের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

৪. পিতৃসুলভ নেতৃত্ব : এ ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করেন। এক্ষেত্রে নেতা কর্মীদেরকে স্নেহের ডোরে আবদ্ধ করেন। এ নেতৃত্ব কখনো কখনো সুফল বয়ে আনলেও কর্মীদের সৃষ্টিশীলতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৬। নির্দেশনার মূলনীতি বর্ণনা কর।

উত্তর: নির্দেশনা হবে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট। আর এই সঠিকতার জন্য প্রয়োজন কিছু নিয়মনীতি মেনে চলা। এই সমস্ত নীতির উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। কারণ নির্দেশনার সাফল্য এর নীতির উপর নির্ভরশীল। নির্দেশনার মূলনীতিসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

১। উদ্দেশ্যের ঐক্যের নীতি : এ বিষয়টিকে দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, প্রথমত, যখন সংগঠনের প্রতিটি স্তরের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একতা থাকবে, তখনই প্রতিটি স্তরে নির্দেশনা একই সুরে গাথা হবে। অন্যথায় বিভিন্ন স্তরের নির্দেশের মধ্যে সংঘাত দেখা দেবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে এর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যের একতা থাকতে হবে।

২। উদ্দেশ্যের প্রতি ব্যক্তির অবদানের নীতি : যে কোন নির্দেশ প্রদান করা হয় পালনের জন্য এবং অধঃস্তন ব্যক্তিগণই নির্দেশ পালন করে। কীভাবে নির্দেশটি পালন করবে এবং তা লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে সহায়তা করবে তা অধঃস্তনদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। কারণ তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব অন্যথায় নয়।

৩। আদেশের ঐক্য নীতি : আদেশের ঐক্য সংগঠনের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে আদেশ উচ্চ হতে নিম্নগামী হয়, কখনও তা উর্ধ্বগামী হয় না। আবার এক বিভাগের প্রধান অন্য বিভাগের প্রধানকে আদেশ দিতে পারে না। আবার এক বিভাগের প্রধান অন্য বিভাগের কর্মীদের আদেশ দিতেও চায় না। কারণ এতে আদেশের ঐক্য থাকে না।

৪। দক্ষতার নীতি : দক্ষতার সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক সরাসরি জড়িত, অর্থাৎ দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে আবার দক্ষতা কমে গেলে উৎপাদনশীলতা ও কমে যায়। তাই যে কোন নির্দেশ দক্ষতার সাথে দেয়া উচিত। অর্থাৎ নির্দেশটি হতে হবে সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে।

৫। যোগাযোগের নীতি : নির্দেশনার কার্যকারিতা অনেকাংশেই সফল যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। কারণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং সে সংক্রান্ত নির্দেশাবলী উচ্চ স্তর হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকলকে জানিয়ে দিতে হবে। এতে সঠিকভাবে উদ্দেশ্যটি অর্জিত হবে।

৬। প্রত্যক্ষ তদারকের নীতি : শুধুমাত্র আদেশ দিয়েই আদেশ দাতা বসে থাকবে তা কিন্তু নয়। আদেশ বা নির্দেশকে তখনই ফলপ্রসূ বলা যাবে, যখন দেখা যাবে আদেশ দাতা এর বাস্তবায়ন তদারক করছে। কারণ অধীনস্তরা আদেশ পালনে অনুপ্রাণিত নাও হতে পারে, আবার গাফিলতিও করতে পারে।

৭। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের নীতি : একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যারা নির্দেশ পালন করে তারাও মানুষ, মেশিন নয়। এদের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক দমননীতি ও অনমনীয় মনোভাব দেখালে কাজ করা কঠিন হবে। তাই সব সময় কর্মীদের সুবিধা অসুবিধা এবং অভাব অভিযোগ ধৈর্যের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এতে কর্মীরা অনুপ্রাণিত হবে এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তারা কাজে আরো বেশী মনোযোগী হবে।

৮। কারণ ব্যাখ্যার নীতি : এটা সম্ভবত মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি যে, কোন কাজ করার কারণ না জানা পর্যন্ত সে ঐ কাজে আগ্রহ পায় না। তাই প্রতিটি নির্দেশ প্রদানের পূর্বে এর উদ্দেশ্য এবং কারণ সঠিকভাবে বর্ণনা করা উচিত, যেন নির্দেশ পালনকারী তার দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। অন্যথায় কাজে সাফলতা নাও আসতে পারে।

উপসংহার: নির্দেশনার উল্লিখিত নীতিসমূহের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সঠিকভাবে নীতিসমূহ অনুসরণের মাধ্যমেই নির্দেশনাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করা যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে রূপদান করা সহজতর হয়ে থাকে।

অধ্যায়-০৭: সমন্বয়সাধন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। সমন্বয়/সমন্বয় সাধন বলতে কী বুঝ?

উত্তর: ভূমিকা : সমন্বয়সাধন সংগঠনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সমন্বয় ছাড়া কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। সমন্বয়হীনতার কারণে সংগঠন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহা সংগঠনের ভুলত্রুটি দূর করে শক্তিশালী একটি কাঠামো প্রদান করে। সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বয়কে ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক নীতি বলা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সংগঠনের গতিশীলতা ফিরে আসে। সমন্বয়সাধনের সংজ্ঞা : সাধারণ অর্থে সমন্বয়সাধন বলতে কোনো সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পাদন করার একটি কৌশল বিশেষ। সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত সমন্বয়েরও একক ও সর্বজন স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন তাত্ত্বিক গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমন্বয়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো :

জেমস ডি. মুনি এর মতে, “সমন্বয়সাধন হচ্ছে কোনো কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিতাত্মক ব্যবস্থা।”

ডিমোক ও ডিমোক বলেন, “প্রশাসনিক সংগঠনের বিভিন্ন অংশগুলোকে যথাযথভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত রাখার অর্থই হচ্ছে সমন্বয় সাধন।

সেকলার হাডসন এর ভাষায়, “সমন্বয় একটি সামগ্রিক কার্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় করে।”

জি. আর. টেরি বলেন, “সমন্বয় হলো সংগঠনের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করা বা বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার এক প্রয়াস।”

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, সমন্বয় হলো কোনো সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি বিশেষ কৌশল। সমন্বয়ের মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন অংশের কাজের সংযুক্তি ঘটিয়ে সমস্ত কার্যকে উদ্দেশ্য অভিমুখে চলতে সাহায্য করে। এর ফলে কাজের দ্বৈততা যেমন পরিহার হয় তেমনি শূন্যতা ও পূরণ হয়।

২। “ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি সমন্বয়সাধন”-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অনেক লেখক সমন্বয়সাধনকে ব্যবস্থাপনার অন্যতম আলাদা কার্য হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে সমগ্র দলগত কর্মপ্রয়াসের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অর্জন যেহেতু ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য সেহেতু সমন্বয়সাধনকে ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি হিসাবেই বিবেচনা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজাতীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের আচরণ ও কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা হয়। ফলে ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এসব প্রতিষ্ঠানে কাজের বিরাজমান পার্থক্যগুলো দূরীভূত করা।

সুতরাং, সমন্বয়ের অভাবে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, উপযুক্ত সময়ে কার্যসম্পাদন হয় না ও বিভিন্ন খরচ বৃদ্ধি পায়, কাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়, বহু কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়, কতিপয় কাজের দ্বৈত সম্পাদন ঘটে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয়। সমন্বয়ের এসব গুরুত্বের জন্যই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি হিসেবে সমন্বয়সাধনকে বিবেচনা করা হয়।

৩। সমন্বয়সাধন ও সহযোগিতার মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর: সমন্বয় ও সহযোগিতা একে অপরের পরিপূরক। যখন কতিপয় ব্যক্তিকে কোনো কর্মভার অর্পণ এবং তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সম্পাদন করা হয়, তখন তাকে সহযোগিতা বলে। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাকেই সমন্বয় বলে। সমন্বয় ও সহযোগিতা যদিও একই অর্থ বহন করে না, তথাপি এ দুটি বিষয় পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল এবং প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাধারণত সমবেত কার্যপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা দেখা দিলেও উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যতাও রয়েছে। সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথপ্রচেষ্টার দ্বারা যে ভিত রচিত হয়, তার উপর সৌধ রচনা করাই সমন্বয়ের প্রদান কাজ। উপযুক্ত ভিতের অভাবে সৌধ যেমন ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তেমনি সহযোগিতার অভাবে সমন্বয় নস্যাত হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতা থাকা অপরিহার্য। সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিমাণ, সময় ও একত্রীকরণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সমন্বয় যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের কার্য সেহেতু এক্ষেত্রে পরিমাণ, সময় ও একত্রীকরণ অপরিহার্য।

আবার সমন্বয়ের অভাবে সহযোগিতাও বিশেষ ফলদায়ক হয় না। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন না হলে পরস্পর বিরুদ্ধ ও এলোমেলো কাজের সূচনা হয়। উপরন্তু, সমন্বয় ছাড়া শুধু সহযোগিতায় বিক্ষিপ্ত ও খাপছাড়া প্রচেষ্টার উদ্ভব হয় এবং কার্যসম্পাদনে বাধা, বিপত্তি ও অসংগতি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই বৃহত্তর কার্যপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সমন্বয়ের অভাবে সহযোগিতা নিরর্থক প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়।

অতএব বলা যায়, সহযোগিতা হলো ভিত্তিরূপ, যার উপর সমন্বয়ের কাঠামো গড়ে উঠে। বিভিন্ন উপাদান তথা কাজের মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় না। তাই আমরা বলতে পারি যে, “সহযোগিতা ছাড়া সমন্বয় কিংবা সমন্বয়ের উদ্দেশ্য - ছাড়া সহযোগিতা অকল্পনীয়।”

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। সমন্বয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব : বর্তমান সময়ে যে কোনো সংগঠনে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বৃহৎ সংগঠনে ব্যাপকসংখ্যক কর্মীর উপস্থিতি ও বিশাল আয়তনের কারণে যেখানে নানাবিধ প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। এই জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য একটি বিষয়। নিম্নে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. দ্বৈততা রোধ : সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানে বহু লোক এক সাথে কাজ করে। এ কারণে কোনো কোনো কাজের দ্বৈততা একান্তই স্বাভাবিক। যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে কোনো কাজের একাধিক বার সম্পাদন রোধ করা যায়।

২. শূন্যতা রোধ : সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে কেবল দ্বৈততা রোধ নয়, অনাকাঙ্ক্ষিত শূন্যতাও রোধ করা সম্ভব এক সাথে অনেক কাজ করার কারণে একটি কাজ একদিকে যেমন একাধিক বার হতে পারে, তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো একটি অংশ কেউ না করার কারণে শূন্যও থেকে যেতে পারে। সমন্বয়ের মাধ্যমে এ শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব।

৩. ঐক্য প্রতিষ্ঠা : সংগঠনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য বিষয়। কারণ কোনো প্রতিষ্ঠানে ঐক্য বজায় না থাকলে সে সংগঠন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তাই সংগঠনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বয়সাধন প্রয়োজন।

৪. ভারসাম্য রক্ষা : যে কোনো সংগঠনে কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আচরণ ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এসব পার্থক্যসমূহ দূর করে প্রশাসনের কাজে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সমন্বয়সাধন একান্ত অপরিহার্য।

৫. দ্বন্দ্ব নিরসন : একই সাথে কাজ করতে গেলে প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ সংগঠিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এর ফলে সংগঠনে তা সংকট ডেকে আনে। এমতাবস্থায় সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব।

৬. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা : প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কারণে সংগঠনের অভ্যন্তরে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। যা প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে বাধা সৃষ্টি করে। প্রশাসনিক এসব বিশৃঙ্খলা দূর করতে সমন্বয় সাধন একান্ত অপরিহার্য।

৭. বৈষম্য দূরীকরণ : প্রশাসনে বা সংগঠনে বিভিন্ন কারণে পদোন্নতি, কর্মবন্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। এসব বৈষম্যের ফলে সংগঠনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়ে থাকে। তাই প্রশাসনে এসব বৈষম্য দূরীকরণে সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন।

৮. অপচয় রোধ : সংগঠনের কার্যক্রমে অপচয় রোধ করার জন্য সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে কাজের দ্বৈততা এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে সময় এবং অর্থের অপচয় হয়, যা সমন্বয়ের মাধ্যমে রোধ করা যায়।

৯. সম্পদের সঠিক ব্যবহার : যে কোনো সংগঠনের জন্য সম্পদের সঠিক ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য বিষয়। কারণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রে সীমিত সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণ করতে হয়। সমন্বয় এমন একটি নীতি যা এই সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অসীম চাহিদা পূরণে সহায়তা করে থাকে।

১০. যোগাযোগ রক্ষা : একটি সংগঠনে বিভিন্ন ইউনিট বা শাখার মাধ্যমে কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিট বা শাখার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

উপসংহার : উপরের আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সংগঠনের বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা দূর করার জন্য সমন্বয়সাধন একান্ত অপরিহার্য। সমন্বয়সাধনের মাধ্যমেই সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। সমন্বয়সাধন কোনো পৃথক কাজ নয় বরং এমন শর্ত বিশেষ যা প্রশাসনের সকল পর্যায়েই পালিত হওয়া উচিত।

২। সমন্বয় সাধনের উপায় বা কৌশল /সমন্বয়ের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

উত্তর: সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনিক সংগঠনের সমন্বয়সাধন করা একান্ত আবশ্যিক। কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময় ও সম্পদের অপচয় এবং সংগঠনের কর্ম সম্পাদনের শৈথিল্য রোধ করে বলে, সমন্বয়সাধন হলো সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমে পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রেরণার মূল চাবিকাঠি। অধ্যবসায়, মনোবল, বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমেই কেবল প্রশাসনিক সংগঠনে সমন্বয় অর্জন করা সম্ভব।

সমন্বয়সাধনের উপায়সমূহ : সাধারণত দুটি উপায়ে বা পদ্ধতিতে সমন্বয়সাধন অর্জন করা যায়:-

ক. আনুষ্ঠানিক উপায় এবং

খ. অনানুষ্ঠানিক উপায়।

ক. আনুষ্ঠানিক উপায় : সংগঠনে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক উপায় কতকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করে।

১. সাংগঠনিক কলাকৌশল : বিভিন্ন সংগঠনে কার্যসম্পাদনের জন্য নানা ধরনের সাংগঠনিক কলাকৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। সাংগঠনিক কলাকৌশলের অংশ হিসেবে যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় সেগুলো হলো সম্মেলন, আন্তঃবিভাগীয় অধিবেশন, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি।

২. আঞ্চলিক পরিষদ : কোনো কোনো প্রশাসনিক সংগঠনে কাজকর্ম আঞ্চলিক প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত করা হয়ে থাকে। ফলে এসব আঞ্চলিক প্রশাসনে কাজের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কাজগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে বলে প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে।

৩. পরিকল্পনা : পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা ব্যতীত যেকোনো কাজের সফলতা লাভ করা সম্ভবপর নয় বিধায় পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে যেকোনো সংগঠনে সমন্বয়সাধন কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে।

৪. বিভিন্ন কমিটি : প্রশাসনিক সংগঠনের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে যেকোনো সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়সাধন হয়ে থাকে।

খ. অনানুষ্ঠানিক উপায় : প্রশাসনিক সংগঠনে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক উপায় বা পদ্ধতিসমূহ সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব নিরসনে সমন্বয় কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক ও বৃহৎ জটিল সংগঠনে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সংগঠনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ও সময় অপচয় রোধের জন্য সমন্বয়সাধন প্রয়োজন।

৩। সমন্বয়সাধনের নীতিমালা বর্ণনা কর।

উত্তর: সমন্বয় সাধনের নীতিমালা : সমন্বয়ের কাজটি সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হয় যেগুলোকে সমন্বয়ের নীতিমালা বলে। Mary parkar Follett সমন্বয় সাধনের ৪টি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

১. সমন্বয় সাধনের জন্য প্রক্রিয়াটি সরাসরি হতে হবে।

২. কার্যারম্ভের প্রাথমিক পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. সমন্বয় সাধনের কার্যাবলি পারস্পরিকভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন।

৪. চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে সমন্বয় গ্রহণ করতে হবে।

H. B Tracker সমন্বয় মূলনীতির প্রসঙ্গে ৭টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. সমস্যার প্রকৃতি ও যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয় তার মাঝে অবশ্যই মৈতক্য থাকতে হবে।

২. সকল দলের অন্তর্নিহিত মূলনীতি সম্পর্কে অবশ্যই সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

৩. সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য অবশ্যই বেশকিছু সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি থাকে।

৪. সংস্থার প্রতিটি ইউনিটের দায়িত্ব-কর্তব্য তাদের কাজের ধরন এবং কাজ ধার্যকরন সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

৫. সময়সূচির বিষয়ে অবশ্যই মৈতক্য থাকতে হবে যাতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময় অনুসারে কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

৬. বিভিন্ন দলের কাজের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন এবং কাজের সুস্পষ্টতার জন্য অবশ্যই নিয়মিতভাবে গঠিত এবং নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত মাধ্যম থাকবে যাতে করে একটি সময়ে একটি দল অন্য একটি দলের কাজ ও অবদান সম্পর্কে জানতে পারে।

৭. সংস্থার অভ্যন্তরে কার্যকর আন্তঃদলীয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংস্থার কর্মীদের মাঝে উত্তম দলীয় প্রচেষ্টা থাকতে হবে এবং পাশাপাশি সংস্থার বোর্ড ও নির্বাহী পরিচালকদের মাঝে ও যথাযথ সমঝোতা করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সমন্বয় একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ার সময় ও প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়নের নিশ্চয়তার বিধান থাকতে হবে। আবার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কাজের কার্যকারিতা যাচাইয়ে মূল্যায়নের এক পদ্ধতি ও সামগ্রিক সমন্বয় প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এ কারণে সমন্বয়ের প্রতিটি পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তথা দিক নির্দেশনা অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।

অধ্যায়-০৮: প্রেষণা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। কর্মী উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রেষণা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: প্রেষণা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার কর্ম প্রচেষ্টার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রেষণা মানুষের অন্তরে নিহিত একটি সুপ্ত শক্তি যা উজ্জীবিত হলে মানুষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে। প্রেষিত ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, স্বীয় উদ্যোগে, অধিকতর দক্ষতার সাথে তার কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়।

প্রেষণা সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বিশারদের সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

নর্থক্রাফট ও নেল এর মতে, “যে প্রক্রিয়া আচরণকে প্রবলভাবে কাজের প্রতি নির্দেশিত করে, তাকে প্রেষণা বলে।”

মাইকেল জুসিয়াস এর মতে, “নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য অন্যকে বা নিজেকে উৎসাহিতকরণ প্রক্রিয়াই হলো প্রেষণা।”

অতএব, উপরের আলোচনা হতে এটা বলা যায় যে, প্রেষণা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাপনাকর্মী প্রক্রিয়া যা কোনো কর্মীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্যসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সে তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়।

২। প্রেষণা চক্র কী?

উত্তর: প্রেষণা কতিপয় মনস্তাত্ত্বিক ও ধারাবাহিক কাজের সমষ্টি যা কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; এই ধারাবাহিক কাজগুলো পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্তি হয় বিধায় এটিকে প্রেষণা চক্র বলা হয়। সুতরাং প্রেষণা চক্র বা প্রক্রিয়া হলো এমন একটি পদ্ধতি যাতে কর্মীরা উৎসাহিত হয়ে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়। প্রেষণা চক্রের চারটি স্তর লক্ষ করা যায়। যথা-



এই সাজেশনটি “HSC
BMT/এইচএসসি বিএমটি” ইউটিউব
চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা
পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারণিত হতে
পারেন।

চিত্রে দেখা যায়, মানুষ প্রথমে বিভিন্ন জিনিসের অভাববোধ করে। এসব অভাব মেটানোর জন্য তাড়নার অনুভব করে। অতঃপর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে এবং উদ্দেশ্য সফল হলে বিশ্রাম নেয়। সুতরাং প্রেষণা চক্র হলো মানবজীবনের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

৩। মাসলো ও হার্জবার্গের প্রেষণা তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উত্তর: নিচে মাসলো ও হার্জবার্গের প্রেষণা তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:-

পার্থক্যের বিষয়	মাসলোর প্রেষণা তত্ত্ব	হার্জবার্গের প্রেষণা তত্ত্ব
১। তত্ত্বের প্রকৃতি	মাসলোর তত্ত্বটি অনেকটা বর্ণনামূলক।	হার্জবার্গের তত্ত্বটি অনেকটা প্রায়োগিক ধরনের।
২। অভাবের ধারাবাহিকতা	অভাব সোপানের মতো ধারাবাহিক।	অভাব সোপান সৃষ্টি বা অনুসরণ করে না।
৩। কর্মীদের স্তর	সকল স্তরের কর্মীদের সাথে সম্পর্কিত।	সাদা পোষাক কর্মী ও পেশাজীবীদের কাজের সাথে অধিক সম্পর্কিত।
৪। অভাবের প্রভাব	সকল অভাবই সময় ভেদে প্রেষণা যোগায়।	গুটিকতক অভাবই প্রেষণা যোগাতে সক্ষম।
৫। প্রেষণা দৃষ্টিভঙ্গি	সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের সকল দিক আলোচনা করে।	ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি মূলত কর্মসম্পর্কিত প্রেষণা নিয়ে আলোচনা করে।

মাসলো ও হার্জবার্গের প্রেষণা তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরতে পারি।

৪। SWOT বিশ্লেষণ কী?

উত্তর: এখানে S = Strength অর্থ শক্তি, W = Weakness অর্থ দুর্বলতা, O = Opportunity অর্থ সুযোগ এবং T = Threat অর্থ ভীতি। ব্যবসায় সাফল্য অর্জনের জন্য উল্লিখিত চারটি অবস্থা শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ভীতি সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যিক। ব্যবসায় সাফল্যের পিছনে এদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

১। শক্তি : উদ্যোক্তাকে জানতে হবে যে ব্যবসায় সংক্রান্ত সে কতটা শক্তিশালী অর্থাৎ প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের চেয়ে সে কোন কোন বিষয়ে শক্তিশালী এবং যথাসময়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করলে ব্যবসায় আবশ্যই সাফল্য আসবে।

২। দুর্বলতা : উদ্যোক্তার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং তা সংশোধনের মাধ্যমে তার সমাধান বের করতে হবে। ৩। সুযোগ-সুবিধা : বর্তমানে কি কি সুযোগ আছে এবং ভবিষ্যতে কি কি সুযোগ আসবে তা ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সুযোগ বার বার আসে না। তাই সুযোগ আসলে কাজে লাগাতে হবে।

৪। ভীতি : ব্যবসায় কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা আছে অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং তা থেকে পরিত্রাণের জন্য সুপরিকল্পিত বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, SWOT বিশ্লেষণ অনুশীলনের মাধ্যমে কোনো উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। প্রেষণার গুরুত্ব আলোচনা কর।

প্রেষণার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি তার মানব সম্পদ তথা শ্রমিক-কর্মী। শ্রমিক কর্মীদের সমষ্টিগত অর্জন ব্যতীত সংগঠনের কার্যসমূহ সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। এ কারণে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের প্রেষণাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রেষণা যেকোনো সংগঠনের জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্ব বহন করে থাকে-

১. মানব সম্পদের কাম্য ব্যবহার: মানব সম্পদের কাম্য ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রেষণা কর্মীদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এতে কর্মীদের কার্যদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

২. অন্যান্য উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার: উৎপাদনের যেসব উপকরণ রয়েছে তার মধ্যে মানব শক্তির ভূমিকা সর্বাধিক। কেননা মানব সম্পদই উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের পথে পরিচালিত করে। এতে বস্তুগত উপাদানের কাম্য ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হয়। আর এটি সম্ভব হয় কর্মীদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণাদানের মাধ্যমে।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধি: কর্মীদের কার্যদক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদেরকে বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়। এতে কর্মীরা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হয়। ফলে তাদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি: প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের অভাব অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটানো হয়। এতে কর্মীদের মাঝে কাজের প্রতি অধিক আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

৫. উৎপাদন বৃদ্ধি: প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায় উপকরণের কাম্য ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হয়। এতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৬. শ্রম ঘূর্ণায়মানতা হ্রাস: প্রত্যেক শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত ও ন্যায্য মজুরি প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়। এতে কর্মীরা কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং শ্রম ঘূর্ণায়মানতা হ্রাস পায়।

৭. অপচয় হ্রাস: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের কাজের প্রতি অধিক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়। এতে শ্রম ঘণ্টার অপচয় অনেকাংশে হ্রাস হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ফলে বস্তুগত উপকরণের অপচয়ও হ্রাস পায়।

৮. মানবীয় সম্পর্কের উন্নয়ন: প্রশিক্ষণ মানবীয় সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একসময় কর্মীকে মেশিন হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে কর্মীদের মাঝে কাজের প্রতি অধিক আগ্রহের সৃষ্টি করে যা মানবীয় সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করে।

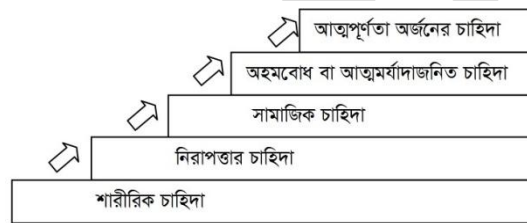
৯. উত্তম শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক: প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিল্প শান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদি শ্রমিক-মালিক উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। অর্থাৎ, কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে উত্তম সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

১০. মনোবল উন্নয়ন: প্রশিক্ষণ কর্মীর উচ্চ মনোবল সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণাদানের ফলে কর্মীর কার্যসম্প্রতি অর্জন সম্ভব হয় এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীর অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠে। ফলে কর্মীরা উৎসাহের সাথে কাজে আত্মনিয়োগ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রশিক্ষণ একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

২। মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব এবং এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

উত্তর: প্রশিক্ষণের বহুল আলোচিত তত্ত্ব হলো বিখ্যাত মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব। ১৯৪৩ সালে তিনি এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাঁচটি চাহিদার বা অভাবের একটি সোপান বিদ্যমান। এগুলো মধ্যে প্রথম চাহিদা পূরণ হলে মানুষ দ্বিতীয় চাহিদা পূরণে তৎপর হয়। এভাবে ক্রমানুসারে চাহিদা পূরণ হতে থাকলে মানুষ চাহিদার শেষ স্তরে পৌঁছে। মাসলোর মতে, ব্যবস্থাপকদের কাজ হচ্ছে কোন কর্মী চাহিদার কোন স্তরে আছে তা নিরূপণ করার পর সে স্তরের চাহিদাগুলো মেটানোর চেষ্টা করা। নিচে মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বটি চিত্রসহ আলোচনা করা হলো:-



১. শারীরিক চাহিদা: যেসব অভাব বা চাহিদা মানুষের শরীরগত তথা জীবনধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলো শারীরিক চাহিদা হিসেবে গণ্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাসস্থান এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজন।

২. নিরাপত্তার চাহিদা: যেসব চাহিদা মানুষের দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তার সাথে জড়িত সেগুলোকে নিরাপত্তার চাহিদা বলা হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা, যেমন চাকুরির নিরাপত্তা, আয়ের নিরাপত্তা, শারীরিক তথা জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদি।

৩. সামাজিক চাহিদা: মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। তাই সমাজের মানুষের সঙ্গে বাস করতে গিয়ে সে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসা, মায়ামমতা, বন্ধুত্বের বন্ধন, অন্যের দ্বারা স্বীকৃতি ইত্যাদিই সামাজিক চাহিদা হিসেবে গণ্য হয়।

৪. অহমবোধ বা আত্মমর্যাদাজনিত চাহিদা: সামাজিক চাহিদা পূরণ হলে মানুষের মান-মর্যাদা বা অহমবোধজনিত চাহিদার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ মানুষ এক্ষেত্রে ক্ষমতা চায়, চায় উচ্চ মর্যাদা এবং অপরের প্রদত্ত সম্মান। এ চাহিদার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে আত্মসম্মান, কাজের স্বাধীনতা, কৃতিত্ব অর্জন, পদমর্যাদা, অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ ইত্যাদি।

৫. আত্মপূর্ণতা অর্জনের চাহিদা: আত্মপূর্ণতা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা মানুষের সর্বোচ্চ স্তরের অভাব বা চাহিদা। এ পর্যায়ে মানুষ তার সৃজনশীলতা তথা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চায়, সে নিজেকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে চায়। এ জাতীয় চাহিদার মধ্যে রয়েছে শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ। এটি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিক শ্রেণি এটির কল্পনাও করতে পারে না।

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের সমালোচনা বা সীমাবদ্ধতা:

১। মাসলোর-এর মতে, মানুষের আচরণ অভাব দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু অভাব ছাড়া মানুষের আচরণ আরও আগে নির্ধারিত হয়।

২। এ তত্ত্বটি সকল সময়ে, সকল স্থানে এবং সকল পরিস্থিতিতে ব্যবহার উপযোগী নয়।

৩। মাসলোর অভাবকে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন, তা সর্বজনস্বীকৃত নয়।

৪। মানুষের অভাব ৫টি একটি পর একটি আসবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিশেষে বলা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা থাকলেও জনপ্রিয়তা, ব্যাপকতা ও মৌলিকতার দিক দিয়ে মাসলোর তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩। হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান বা প্রশিক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বটি আলোচনা কর।

১৯৫৯ সালে হার্জবার্গ, মার্সলার ও সিনকার ম্যান আমেরিকার পিটার্সবার্গ শিল্প এলাকায় গবেষণা চালিয়ে 'দ্বি-উপাদান তত্ত্ব' উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কর্মীদের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দু'ধরনের উপাদান প্রয়োজন। এগুলো হল:

১. প্রেষণামূলক উপাদান (Motivational Factors) ২. হাইজিন উপাদান (Hygiene Factors)

১. প্রেষণামূলক উপাদান: এগুলো শ্রমিকর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। সাফল্যের স্বীকৃতি, উন্নতির সুযোগ, প্রতিষ্ঠানের পলিসি, পদোন্নতির সুযোগ ইত্যাদি প্রণোদনাদানকারী উপাদান। হার্জবার্গ বলেছেন, প্রেষণামূলক উপাদানগুলো তখনই ভালোভাবে কাজ করবে যখন প্রতিষ্ঠানে 'হাইজিন' উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকবে।

২. হাইজিন উপাদান: যে সকল উপাদান লোকজনের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সাথে জড়িত তাদেরকে হাইজিন উপাদান বলে। হাইজিন উপাদানগুলো কর্মীদের প্রণোদিত করে না। এগুলোর অভাবে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। যেমন, তত্ত্বাবধান পরিবেশ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, বেতন, চাকরির নিরাপত্তা, কার্য পরিবেশ ও মর্যাদা ইত্যাদি।

অধ্যায়-০৯: নিয়ন্ত্রণ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে?

উত্তর: ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ হলো নিয়ন্ত্রণ। প্রাতিষ্ঠানিক জগতে নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাবলি সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যফল পরিমাপ করা এবং কোনো বিচ্যুতি হলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বুঝানো হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা কিংবা নির্ধারিত মান অনুসারে কাজকর্ম চলছে কিনা তা দেখাই নিয়ন্ত্রণের কাজ।

উইরিখ ও কুঞ্জ-এর মতে “পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে কার্য সম্পাদিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সম্পাদিত ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজ পরিমাপ ও সংশোধন করাকেই নিয়ন্ত্রণ বলে।”

হেনরি ফেয়ল-এর মতে, “নিয়ন্ত্রণ হলো গৃহীত পরিকল্পনা, জারিকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা” অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের-এর ভাষায়, “পরিকল্পনা অনুসারে কার্য সম্পাদন হচ্ছে কি-না তা নিরীক্ষণ করা, প্রকৃত কার্য ও নির্দিষ্ট কার্যের মধ্যে বিচ্যুতি নিরূপণ করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে।”

পরিশেষে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা বা পূর্ব নির্ধারিত মান অনুযায়ী কার্যাবলি সম্পাদিত হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা এবং কোনরূপ বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার কারণ নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হলে তা চলমান রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

২। মূল্যায়ন বলতে কী বুঝ?

উত্তর: মূল্যায়ন শব্দটি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কাজকে মূল্যায়ন করে তার সফলতা বা ব্যর্থতা পরিমাপ করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, মূল্যায়ন হলো লক্ষ্যের সাথে বর্তমান কাজের তুলনামূলক ফলাফল। ব্যাপকভাবে বলা যায়, পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে অর্জিত ফলাফল তুলনা করা এবং ফলাফল কম বা বেশি হলে তার পরিমাণ বের করার পদ্ধতিকে মূল্যায়ন বলা হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্য থাকে; যা অর্জনের জন্য সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এরূপ প্রচেষ্টা শতভাগ ফলপ্রসূ হবে তা নয়। সুতরাং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো কর্মী কতটুকু, কোনো পদ্ধতি কতটুকু, কোনো উপাদান কতটুকু অবদান রেখেছে তা জানা প্রয়োজন। আর যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরূপ অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় তাকে মূল্যায়ন বলে। প্রতিষ্ঠানে মূল্যায়ন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন- কর্মী মূল্যায়ন, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন, কাঁচামালের কার্যকারিতা মূল্যায়ন ইত্যাদি। তবে মূল্যায়ন যে ধরনেরই হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই- আর তা হলো পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের সাথে বর্তমান কাজের তুলনা করা ও তাদের বিচ্যুতি নির্ধারণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, মূল্যায়ন হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে অর্জিত ফলাফল তুলনা করা যায় এবং ফলাফল কম বা বেশি হলে তার পরিমাণ বের করা যায়।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর: নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: একটি প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের এসব গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা: পরিকল্পনার সাথে নিয়ন্ত্রণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সঠিক নিয়ন্ত্রণ কৌশলের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়। ফলে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

২। কর্তৃত্ব অর্পণ: প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যবস্থাপক নিশ্চিত অধস্তনের নিকট কর্তৃত্ব অর্পণ করতে পারেন।

৩। লোকসানের ঝুঁকি হ্রাস: সঠিক ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে সব রকমের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় বলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এতে প্রতিষ্ঠানে লোকসানের ঝুঁকি কমে যায়।

৪। সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ: পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কাজ পরিচালিত না হলে বুঝতে হবে কাজের ক্ষেত্রে কোথাও সমস্যা রয়েছে। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ সমস্যার কারণ চিহ্নিত করতে পারেন এবং যথাসম্ভব তা সংশোধনও করতে পারেন।

৫। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: উত্তম নিয়ন্ত্রণ-কৌশল প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠানের উপরের স্তরে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখার প্রয়োজন হয় না। এর মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা অযোগ্য ব্যবহার কমানো যায় বিধায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়।

৬। সমন্বয়সাধনে সহায়তা: কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মীর কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। সমন্বয়সাধনের কারণে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭। পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা: প্রতিষ্ঠানে কিংবা এর পরিবেশে কোনো পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এ পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে।

৮। অপচয় হ্রাস: সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি তার দায়িত্ব ঠিক পরিকল্পনা মোতাবেক পালন করতে সচেষ্ট হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের অপচয় হ্রাস পায়।

৯। ব্যবস্থাপকের সময় ও শ্রম শাসয়: প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলে ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখাশুনা করতে অধিক সময় দিতে হয় না। বরং অন্যান্য কাজে তিনি অধিক মনোনিবেশ করতে পারেন। ফলে তার সময় ও শ্রম বাঁচে।

১০। ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন: নিয়ন্ত্রণহীনতা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সীমা লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করে। এছাড়া সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত ব্যবস্থাপনার অধিকাংশ কাজই বেপরোয়াভাবে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণে ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও সুশৃঙ্খল করতে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ অত্যাাবশ্যক।

ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কার্যাবলি সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে কোনো কোনো লেখক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন: ‘Management itself is controlling’ অর্থাৎ ব্যবস্থাপনাই নিয়ন্ত্রণ।

২। নিয়ন্ত্রণের কৌশল বা পদ্ধতি বা উপায়সমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে যে সব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা নিচে আলোচনা করা হল :

১. বাজেট : বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল হচ্ছে বাজেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পনাকে যখন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বাজেট বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বাজেটের মাধ্যমে মান নির্ধারণ করা হয় এবং পরে তার সাথে অর্জিত ফলাফল তুলনা করা হয়। কোন বিচ্যুতি বা পার্থক্য থাকলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য বিধায় এটি খুব জনপ্রিয়।

পরিসংখ্যানিক উপাত্ত: সংখ্যাভিত্তিক তথ্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করে নিয়ন্ত্রণ কাজ করা যায়। যেমন, বিক্রয় কিংবা ব্যয় শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পেল বা হ্রাস পেল তা পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বের করা যায়। 'কালীন সারণি' বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্যের তুলনা করে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. বিশেষ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ: কোন নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবেদন সহায়তা করে থাকে। কোন কাজের উপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়নের ব্যবস্থা থাকলে তার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাহী সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

৪. কার্য নিরীক্ষা : নিয়ন্ত্রণের আর একটি কৌশল হচ্ছে কার্য নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা যা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে ও নিয়মিতভাবে কাজের মূল্যায়ন করে থাকে। এ কাজটি কোন কর্মচারী বা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক সম্পাদন করে থাকে। ব্যবসায়ের হিসাব, অর্থ সংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এরূপ নিরীক্ষা অনুসরণ করা হয়। তবে অন্যান্য কাজেও এটি প্রয়োগ করা যায়।

৫. ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ : ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের দ্বারাও প্রতিষ্ঠানের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অধস্তনদের কাজের ভুল-ত্রুটি নির্ণয় করেন। এ পদ্ধতিতে পরে তিনি পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে সংশোধনমূলক কার্য সম্পাদন করেন।

৬. তথ্য প্রযুক্তি: নিয়ন্ত্রণের একটি আধুনিক কৌশল বা উপায় হল তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। এ কারণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৭. গ্যান্ট চার্ট: Henry L. Gantt নামক একজন ব্যবস্থাপনা বিশারদ 'সময় ও ঘটনা নেটওয়ার্ক' বিশ্লেষণের যে চার্ট তৈরি করেন, তা-ই গ্যান্ট চার্ট নামে পরিচিত। এটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিক কার্য সম্পাদনের নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এ কারণে কার্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

৮. পার্ট : এটি হল একটি কার্যপ্রণালি মূল্যায়ন কৌশল। এ কৌশলের দ্বারা কাজের বিভিন্ন অংশের সময় ও ব্যয়ের সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন করা হয়। ফলে এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্য সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৯. সমচ্ছেদ বিন্দু বা ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ: এটি একটি রেখাচিত্র পদ্ধতি। এর মাধ্যমে আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। সমচ্ছেদ বিন্দু হচ্ছে সেই বিন্দু যেখানে আয় ও ব্যয় সমান হয়। এটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

১০. প্রোগ্রাম বাজেটিং: বৃহৎ উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল। এ ধরনের বাজেট দ্বারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। এতে মূনাফার সাথে ব্যয়ের বিষয়টি সঠিক আছে কি-না তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

উল্লিখিত কৌশলগুলো ছাড়াও তথ্য বিশ্লেষণ, কম্পিউটারের ব্যবহার, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিরস্কার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত স্থাপন, স্থায়ী নিয়ম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

৩। ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর : ভূমিকা : প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে কতকগুলো ব্যয় কেন্দ্রে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি ব্যয় কেন্দ্রের দায়িত্ব এক একজন ব্যবস্থাপকের উপর অর্পণ করা হয়। এরূপ ব্যবস্থাপক তার নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিটের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উপায় : ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাপক যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। অপচয় রোধ : যে-কোনো ধরনের অপচয় ব্যবসায়ের ব্যয় বৃদ্ধি করে। এ ব্যয়গুলো হতে পারে- কাঁচামালের অপচয়, বিদ্যুতের অপচয়, মেশিনের অপচয়, জায়গার অপচয়, জনশক্তির অপচয়, মজুদপণ্যের অপচয় ইত্যাদি। তাই ব্যবস্থাপক এ সকল অপচয় রোধ করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২। যন্ত্রপাতি ও কর্মীর উপযোগিতা মূল্যায়ন : কোনো কোনো কাজ আছে, যেগুলো মেশিনের দ্বারা সম্পাদন করলে পণ্যের গুণগতমান উন্নত হয় এবং খরচও কম পড়ে। এসব কাজ চিহ্নিত করে মেশিনের দ্বারা সম্পন্ন করা উচিত। ঠিক তদ্রূপভাবে যে- সকল কাজ কর্মীরা হাতে সম্পন্ন করলে মান ঠিক থাকে এবং খরচও কম হয় তা কর্মীদের দিয়ে সম্পাদন করা উচিত।

৩। ব্যয় সংকোচন মনোভাব সৃষ্টি : ব্যবস্থাপকের একার পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সংকোচন করা সম্ভব নয়। ব্যয় সংকোচনের জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই প্রতিটি কর্মী যাতে অপচয় ও ব্যয় সম্পর্কে সচেতন হয় তার জন্য তাদের মধ্যে ব্যয় সংকোচন মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

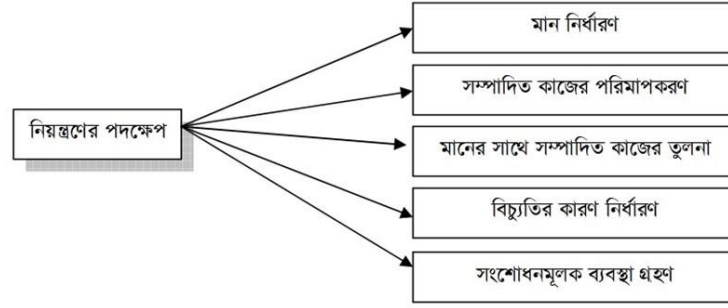
৪। সকল উপাদানের সদ্ব্যবহার : উৎপাদনের যে-সকল উপাদান আছে সেগুলোর প্রতিটির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ভূমি, শ্রমিক, মেশিন, কাঁচামাল, অর্থ ইত্যাদি সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ সকল উপাদানের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ব্যয় বহুগুণ হ্রাস পাবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৫। অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ : কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, অস্থায়ী বা খণ্ডকালীন কর্মী নিয়োগ করে ব্যয় অনেকাংশে কম হয়। তাই অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানে যে-সব ব্যয় উপাদান থাকে সে-সকল উপাদানকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কেবল ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ বিষয়টিকে কোনো একটি উপাদান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত নয়।

৪। নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপের সমষ্টি। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদ ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমন- W. H. Newman নিয়ন্ত্রণের ৩টি ধাপ, যথা মান নির্ধারণ, কার্যফল পরীক্ষা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। নিউপোর্ট ও ট্রি ওয়াথ ৫টি কার্য, যথা মান নির্ধারণ, কার্য পরিমাপকরণ, মানের সাথে কার্যফলের তুলনাকরণ, এ দুয়ের পার্থক্য পরিমাপ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। এগুলো বিবেচনা করে আমরা নিয়ন্ত্রণের নিম্নোক্ত পাঁচটি পদক্ষেপ আলোচনা করবো:



১. মান নির্ধারণ: নিয়ন্ত্রণ কার্যের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আদর্শ মান প্রতিষ্ঠা। মান হচ্ছে পরিকল্পনার কতকগুলো নির্ধারিত বিন্দু যার দ্বারা ব্যবস্থাপক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। প্রত্যেকটি মান সুনির্দিষ্ট হয়। প্রত্যেক মান অর্জনের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কি হবে তার উপর ভিত্তি করেই মান নির্ধারণ করা হয়।

২. সম্পাদিত কাজের পরিমাপকরণ : দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত মানের বিপরীতে প্রকৃত কার্যফল পরিমাপ করে দেখা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরিকল্পনা মোতাবেক কতটুকু কার্য সম্পাদিত হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা বিশ্লেষণ ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজের অগ্রগতি বা ফলাফল পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

৩. মানের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা: নিয়ন্ত্রণের তৃতীয় পদক্ষেপে নির্ধারিত মানের সাথে প্রকৃত কার্যফলের তুলনা করা হয়। আদর্শ মান বা প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সম্পাদিত কার্যফলের তুলনা করে কোন রকম বিচ্যুতি থাকলে তাও নিরূপণ করা হয়। তবে যে সকল মান সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না, তা তুলনা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, একটি মান হলো 'গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি'। এরূপ মান সংখ্যাত্মক না হওয়ায় মূল্যায়ন করা যথেষ্ট দুরূহ।

৪. বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ: আদর্শ মানের সাথে সম্পাদিত কার্যফলের কোন বিচ্যুতি বা পার্থক্য দেখা গেলে এ পর্যায়ে সঠিকভাবে তা নিরূপণ করা হয় এবং তা যথাযথ বিশ্লেষণ করে বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ করা হয়। পরে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কারণ নির্ধারণ অপরিহার্য বিষয়।

৫. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ: নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে বিচ্যুতি বা ভুল-ত্রুটি শোধরানো। বিচ্যুতি নির্ধারণ ও তার সঠিক কারণ নিরূপণের পর এ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ, অধস্তনদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, কর্মী বরখাস্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। কাঁচামালের সরবরাহে কোন দুর্বলতা আছে কিনা, উৎপাদনে গাফিলতি রয়েছে কি-না ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করেও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সংশোধনমূলক পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, নিয়ন্ত্রণের এ পদক্ষেপগুলো একটি অন্যটির সাথে পরস্পর ধারাবাহিকভাবে সম্পর্কিত। তাই কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উপরিউক্ত ধাপগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হয়।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি
বিএমটি” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন
চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারণিত
হতে পারেন।